# নীড়

## লিও টলস্টয়

অনুবাদ করেছেন

অমিয়কুমার চক্রবর্তী
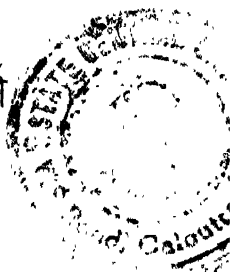
৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

টলস্টয়ের Family Happiness 'নীড়' নামে বাঙলা হয়ে প্রকাশিত হল। দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিয়ে লেখা এই বিখ্যাত উপন্যাস পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, এবং শুধু ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়েছে অন্ততঃ দুটি বিভিন্ন অনুবাদ।

রাশিয়ান ভাষা জানা না থাকায় ইংরেজী অনুবাদের শরণ নিতে হয়েছে, সুতরাং অনুবাদ কতদূর মূলানুগ হয়েছে বলতে পারছি না। তবে ভরসার কথা এই যে, দুটো বিভিন্ন ইংরেজী অনুবাদের সাহায্য নেবার সুযোগ পেয়েছি।

অনুবাদের সময় প্রধান লক্ষ্য হয়েছে যাতে অনুবাদ যথাযথ হয়। সামান্য অদলবদল করলে হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদ আরো সাবলীল হত, কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেও টলস্টয়ের কথা চিন্তা করে সে লোভ সংবরণ করেছি।

অনুবাদক

শরৎকালে মা মারা যান, সেই অশৌচ আমরা পালন করছিলাম। সেবারের শীতটা আমার কাতিয়া আর সোনিয়ার সঙ্গে দেশেই কেটেছিল।

কাতিয়ার সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা অনেকদিনের। আমাদের ধাই সে, আমরা সবাই তার হাতে মানুষ। কাতিয়াকে আমি চিনি, আর তাকে ভালবেসে এসেছি আমার ছেলেবেলার কথা যখন থেকে মনে আছে তখন থেকেই। সোনিয়া আমার ছোট বোন।

পক্রভ্স্কোর অন্ধকার বাড়িতে তখন নিরানন্দে আমাদের দিন কাটছিল, মাঝে মাঝে এমন দমকা বাতাস বইছিল যে তুষারকণাগুলো জানলা ছাড়িয়েও উঁচু পর্যন্ত উঠছিল, অনবরত তুষারের ঝাপটা লেগে লেগে জানলার কাঁচগুলো হয়ে উঠেছিল ঝাপসা। সারা শীতকালটা আমরা পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোই নি। অতিথি-অভ্যাগত আমাদের কমই হত, যে দু-একজন আসত তারাও এই বিষণ্ণ আবহাওয়াকে হালকা করতে পারত না। একটা বিষাদের ছায়া যেন সবসময়ে তাদের মুখে লেগেই থাকত। খুব ধীরে ধীরে তারা কথা কইত, যেন জোরে কথা কইলে ঘুমন্ত কেউ জেগে উঠবে। ভুলেও তারা হাসত না কখনো, বরং আমাকে দেখে, বিশেষ করে শোকের পোষাক পরা সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলত, কখনো বা কাঁদত পর্যন্ত। মৃত্যুর অনুভূতি যেন সমস্ত বাড়ির আবহাওয়ায় ব্যাপ্ত হয়ে ছিল, বাতাসে বাতাসে যেন ছড়ানো ছিল

মৃত্যুর শোক, মৃত্যুর আতঙ্ক। মায়ের ঘর চাবি বন্ধ থাকত, কিন্তু শুতে যাবার সময় মায়ের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে সেই ঠাণ্ডা, খালি ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখার এক অস্বস্তিকর বাসনা আমার মনে জাগত।

আমার বয়স তখন সতেরো। মা যে বছর মারা যান, ঠিক হয়েছিল সেই বছরে আমরা পিটার্সবার্গে যাব, মা আমাকে সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে শেখাবেন। মায়ের মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত শোকাতুর হয়েছিলাম সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই শোকের অন্তরালে বাসা বেঁধেছিল আর এক দুঃখ—বুঝেছিলাম, আমার যৌবন, আমার এই রূপ (যার প্রশংসা সবার কাছে শুনতাম) নিয়ে আরো একটা শীত আমাকে এই পল্লীর নির্জনতার মধ্যে কাটাতে হবে। তখনো শীতের শেষ হয়নি, তবুও এই বিষাদ, নিঃসঙ্গ জীবনের এই দৈনন্দিন একঘেয়েমি আমার মধ্যে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে ঘর ছেড়ে একটু কোথাও বেরোব, পিয়ানোটা একটু খুলব বা একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করব এতটুকু উৎসাহও আর আমার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। কাতিয়া যখন বলত চুপচাপ বসে না থেকে কোন কাজে মন দাও, বলতাম, কাজ করবার মত তেমন শক্তি আমার নেই। কিন্তু মনে মনে বলতাম,—কী হবে? জীবনের পরম লগ্নই যখন এভাবে নষ্ট হতে বসেছে তখন আর কাজ করা না করায় কতটুকু যায় আসে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর ছিল চোখের জল ফেলা।

শুনতাম আমি নাকি রোগা হয়ে যাচ্ছি, আমার রূপ নষ্ট হতে বসেছে। হয়ত তাই, কিন্তু কী যায় আসে তাতে, কার জন্য এ রূপ! স্থির জেনেছিলাম, আমার সমস্ত জীবনই এই নিঃসঙ্গ একঘেয়েমির মধ্যে

দিয়ে অতিবাহিত হবে—এ থেকে মুক্তিলাভের শক্তি আমার নেই, এমনকি যে ইচ্ছাও আর আমার মনে জাগে না। ক্রমে শীত শেষ হয়ে এল। কাতিয়া আমার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, ঠিক করল, আমাকে নিয়ে বাইরে কোথাও যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেজন্য দরকার টাকার। মায়ের মৃত্যুর পর আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমাদের ছিল না। আমাদের অবিভাবকের আসবার কথা আছে, তিনি এসে বিষয়-সম্পত্তি ঠিক করে দেখে দেবেন। তাঁর আসবার সময় হয়েছে।

মার্চ মাসে তিনি এলেন।

আমি তখন শূন্যমনে ছায়ামূর্তির মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোন কাজে উৎসাহ নেই, এমনকি প্রাণে কোন বাসনা পর্যন্ত নেই। কাতিয়া বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সার্জি মিখায়েলিচ এসেছেন। আমাদের খবর নিতে লোক পাঠিয়েছেন আর বলেছেন, এখানে এসেই ডিনার সারবেন। চাঙ্গা হয়ে ওঠো মাসেচ্‌কা লক্ষীটি, নইলে উনি কী মনে করবেন বলতো? তোমাদের সবাইকে কত ভালবাসতেন উনি!

সার্জি মিখায়েলিচ আমাদের প্রায়—প্রতিবেশী। বয়সে অনেক ছোট হলেও তিনি বাবার বন্ধু ছিলেন। তিনি এলে হয়ত আমাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসতে পারে, গ্রাম ছেড়ে সহরে যাওয়ার ব্যবস্থাও হতে পারে সম্ভব। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভক্তি করা, ভালবাসা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল। তাই কাতিয়া যখন আমাকে চাঙ্গা হতে বলল সে ঠিক বুঝেছিল যে, অন্য সবার কাছে যাই হোক, তাঁর কাছে অন্তত অমন বিষণ্ণ ভাব নিয়ে যেতে

আমার খুব কষ্ট হবে। কাতিয়া থেকে, তার ধর্মমেয়ে সোনিয়া থেকে আরম্ভ করে আস্তাবলের সহিসটা পর্যন্ত সকলের মতই আমিও তাঁকে ভালবাসি, এ যেন আমার পুরোনো অভ্যাস। তাঁর প্রতি আর-এক মনোভাবও আমার ছিল, মায়ের একটি কথা থেকেই সে মনোভাবের উৎপত্তি। মা একদিন বলেছিলেন,—আমার ইচ্ছা ওঁর মত একজনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। কথাটা শুনে আমি শুধু আশ্চর্য নয়, রীতিমত বিরক্তও হয়েছিলাম। আমার স্বামীর কল্পনা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা,—রোগা, ফ্যাকাসে দেখতে, মুখে বিষণ্ণ ভাব লেগে আছে—এমনটি; আর সার্জি মিথায়েলিচ হলেন মধ্যবয়সী, লম্বা-চওড়া চেহারার; হাসিখুসি ভাবটা যেন সব সময়ে মুখে লেগেই রয়েছে। কিন্তু তবুও মায়ের কথাটা আমার ঠিক মনে রয়ে গেছে। ছ'বছর আগে পর্যন্ত, আমার বয়স যখন এগারো, তিনি আমাকে 'তুই' বলতেন, আমার সঙ্গে খেলতেন, আমার আদরের নাম 'ভায়োলেট' বলে আমাকে ডাকতেন। সেই বয়সেও আমি ভয়ে-ভয়ে চিন্তা করতাম, হঠাৎ যদি উনি আমার পাণি-প্রার্থনা করে বসেন তো আমি কী করব?

সেদিন ডিনারে অতিথির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। ডিনারের আগেই তিনি এলেন। জানলা দিয়ে দেখলাম একটা ছোট গাড়ি করে তিনি আসছেন, কিন্তু গাড়িটা মোড় ফিরতেই আমি তাড়াতাড়ি বৈঠকখানা ঘরে চলে গেলাম, ঠিক করলাম, এমন ভাব দেখাব যেন তিনি আসায় আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি। কিন্তু তাঁর পায়ের শব্দ আর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে, আর হলঘরে কাতিয়ার নড়াচড়ার আভাস পেয়ে আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না, নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে

দেখা করলাম। কাত্রিয়ার হাতে হাত মিলিয়ে তিনি মৃদু হাসছিলেন আর জোরে জোরে কথা কইছিলেন, আমাকে দেখে থামলেন। নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আমার অস্বস্তি লাগল, মুখেচোখে ব্রীড়ার ভাব ফুটে উঠল।

এ কি সত্যি তুমি? দু'হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্টভাবে তিনি বললেন, এতবড় পরিবর্তনও কি সম্ভব? ওঃ, কত বড় হয়েছ তুমি! এতদিন তোমাকে 'ভায়োলেট' বলে এসেছি, কিন্তু এখন তো দেখছি তুমি পূর্ণপ্রস্ফুটিত গোলাপ হয়ে উঠেছ!

বড় বড় হাতে আমার হাত ধরে তিনি জোরে চাপ দিলেন, হাতটা প্রায় ব্যথা করে উঠল। আমার হাত চুম্বন করবেন ভেবে আমি ওঁর দিকে ঝুঁকে পড়লাম, কিন্তু তিনি শুধু আর-একবার আমার হাতে চাপ দিয়ে আগের মতই স্থির, উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার চোখে চোখ রাখলেন।

ওঁকে যখন শেষ দেখি, তারপর ছ'বছর কেটে গেছে। অনেক বদলে গেছেন; বয়স বেড়েছে, গায়ের রঙ আগের চেয়ে ময়লা হয়ে গেছে। আজকাল আবার গোঁফ রাখেন,—এমন গোঁফ, যা তাঁকে একটুও মানায় না। কিন্তু তবুও তিনি প্রায় আগের মতই রয়ে গেছেন,—সেই সহজ সরল ব্যবহার, প্রতিভাদীপ্ত দুই চোখ, ছেলেমানুষি-মাখানো সেই সহৃদয় হাসি।

পাঁচ মিনিট পরেই আর তিনি অভ্যাগত রইলেন না, সবার বন্ধু হয়ে উঠলেন, এমন কি ভৃত্যেরা পর্যন্ত যে ভাবে তাঁর হুকুম তামিল করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল তাতে বেশ বোঝা যায় যে তারাও তাঁকে পছন্দ করে ফেলেছে।

মায়ের মৃত্যুর পর যে-সব প্রতিবেশী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁর ব্যবহার কিন্তু মোটেই তাঁদের মত হ'ল না। তাঁরা যখন আমাদের কাছে বসতেন, ভাবতেন বুঝি চুপ করে থাকাই তাঁদের কর্তব্য,—চুপ করে থাকা আর চোখের জল ফেলা। অথচ বেশ একটা ফুর্তির ভাব বজায় রেখেই তিনি অনর্গল কথা কয়ে চলেছেন, মায়ের সম্বন্ধে কোন কথাই তুলছেন না। তাঁর এই উদাসীনতা আমার আশ্চর্য মনে হয়েছিল, এমন কি অমন নিকট বন্ধুর কাছ থেকে এ হেন ব্যবহার অন্যায় বলেই ভেবেছিলাম। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম, তাঁর যে ব্যবহারকে আমার উদাসীন বলে মনে হয়েছিল, আসলে তা উদাসীন নয়, আন্তরিক ; এবং এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বিকেলবেলা কাতিয়া বৈঠকখানা ঘরে তার পুরোনো জায়গায় বসে চা পরিবেশন করল—মা থাকতে এখানেই বসত সে। সোনিয়া আর আমি তাঁর কাছে বসলাম। আমাদের পুরোনো বাটলার গ্রিগরি বাবার একটা পাইপ কোত্থেকে খুঁজে এনে তাঁর হাতে দিল। অতীত দিনের অভ্যাস মত তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন।

ওঃ, কী সাঙ্ঘাতিক পরিবর্তনই না এই বাড়িতে ঘটে গেছে, ভাবতেও কেমন লাগে! পায়চারি বন্ধ করে তিনি বলে উঠলেন।

হ্যাঁ, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাতিয়া সায় দিল। সামোভারের ঢাকাটা চাপা দিয়ে কাঁদ কাঁদ মুখে তাকাল তাঁর দিকে।

বাবাকে তোমার মনে পড়ে তো? আমার দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

খুব স্পষ্ট নয়।

সবাই থাকলে এখন কী সুখেরই না হত! আস্তে আস্তে চিন্তাগ্রস্ত দৃষ্টিতে আমার চোখে চোখ রেখে তিনি বললেন।

তারপর গলার স্বর আরো নামিয়ে তিনি বললেন, আমি তাঁকে খুব ভালবাসতাম। মনে হল যেন তাঁর চোখ দুটো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ঈশ্বর আবার এমন ওর মাকেও নিয়ে গেলেন! বলেই কাতিয়া গামছাটা টিপটের ওপব রেখে রুমাল বের করে কান্না শুরু করল।

সত্যি, কী বিরাট এই পরিবর্তন! অন্যদিকে ফিরে তিনি বলে উঠলেন। একটু থেমে আবাব বললেন, সোনিয়া, তোমার খেলনাগুলো দেখাও তো! বলেই তিনি পার্লাবে চলে গেলেন। তিনি চলে যেতে আমি জলভবা চোখে কাতিযার দিকে তাকালাম।

কাতিয়া বলল, কী চমৎকার ভদ্রলোক! এই অনাত্মীয় ভাল-মানুষটিব সহৃদয় সহানুভূতিব মধ্যে সত্যিই আমিও অনেকটা সান্ত্বনা পেলাম।

পার্লার থেকে তাঁর আর সোনিযার চলাফেরার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তাঁব শিশুসুলভ উচ্চকণ্ঠও কানে আসছে। তাঁর চা ওখানেই পাঠিয়ে দিলাম। তাঁব পিযানোব কাছে বসার আর সোনিয়ার ছোট ছোট আঙুল ধরে পিযানো বাজানোব শব্দও কানে এল।

তারপর শুনলাম তিনি ডাকছেন,—মারিযা আলেকজান্দ্রোভ্না, এসো এখানে, কিছু বাজাও শুনি।

ওঁর এই সচ্ছন্দ ব্যবহার, আব বন্ধুভাবে এইবকম আদেশ করা আমার বেশ লাগল। আমি ওঁর কাছে গেলাম।

এইটে বাজাও, বলে বেটোফেনের একটা গানের বই থেকে

মুনলাইট সোনাটা খুলে বললেন—দেখি কেমন বাজাও তুমি। বলে চায়ের কাপটা নিয়ে ঘরের এক কোনে চলে গেলেন।

কেন জানিনা আমার মনে হল যে, ওঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা, কিংবা আমি ভাল বাজাতে পারিনা এ অজুহাত দেখানো—এ আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি পিয়ানোয় বসলাম, যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম ভাল বাজাতে। আমি জানতাম উনি সঙ্গীত বোঝেন, ভালও বাসেন; তাই ভয় হল যে উনি আমার সমালোচনা করবেন। চা-পর্বের সময় অতীত দিনের আলোচনার ফলে পুরোনো যে স্মৃতি জেগে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ার সঙ্গে পিয়ানোর সুরের বেশ মিল হচ্ছিল, আর আমিও যেন বেশ ভালই বাজিয়েছিলাম। কিন্তু একটা অংশ তিনি কিছুতেই বাজাতে দিলেন না, কাছে এসে বললেন, না, ওটা তোমার ঠিক হচ্ছেনা, থাম ; যদিও অবশ্য তোমার আরম্ভটা মন্দ হয়নি। তোমার মধ্যে সুর আছে মনে হচ্ছে। এই পরিমিত প্রশংসাতেও আমি অত্যন্ত খুসি হলাম, আমার মুখ-চোখ আরক্ত হয়ে উঠল। বাবার এক বন্ধু, বাবারই সমসাময়িক একজন আমার সঙ্গে গম্ভীরভাবে আলোচনা করছেন, আর ছোটটি মনে করছেন না,—একথা মনে হতে আমি খুসি হলাম, বিস্ময় বোধ করলাম। সোনিয়াকে শুইয়ে দেবার জন্য কাতিয়া ওপরে চলে গেল, আমরা দুজন এক-একা রয়ে গেলাম।

বাবার কথা, বাবার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সূত্রপাতের কথা, কেমন সুখে তাঁদের দিন কাটত সেইসব পুরোনো গল্প (আমি তখন সবে পড়াশুনো শুরু করেছি, পুতুল-খেলা খেলছি) এমনি অনেক কিছুই তাঁর কাছে শুনলাম। তাঁর কথা শুনতে শুনতে এক নতুন আলোয়

যেন বাবাকে দেখলাম, সাদাসিধে, আদর্শ চরিত্রের লোকটি। আমার কী রুচি, কী পড়াশুনো করছি, কী আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, এ সমস্তও উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন। ভদ্রলোক আমাকে কত খ্যাপাতেন, কত পুতুল তৈরি করে দিতেন ; কিন্তু সে আমুদে লোকটি কোথায় মিলিয়ে গেছে ; তার জায়গায় এই অনাড়ম্বর, দয়ামায়ায় ভরা গম্ভীর প্রকৃতির লোকটিকে শ্রদ্ধাভক্তি না করে পারলাম না। কত সহজ তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া, কত আরামের! কিন্তু তবুও কেমন একটা ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। প্রতিটি কথা সাবধানে, খুব ভেবেচিন্তে বলছিলাম ;—শুধু বন্ধুকন্যা হিসেবেই আমি এতদিন ওঁর অযাচিত স্নেহ পেয়ে এসেছি—ঠিক করলাম এবার চেষ্টা করব নিজেকে সে স্নেহের উপযুক্ত করে তুলতে।

সোনিয়াকে শুইয়ে দিয়ে কাতিয়া ফিরে এল, তাঁর কাছে অভিযোগ জানালো যে আমি সবসময়ে মনমরা হয়ে থাকি। আমি কোন কথা কইলাম না।

আরে, সবচেয়ে বড় কথাটাই তাহলে ও আমাকে বলেনি! আমার দিকে ফিরে মাথা দুলিয়ে, ধমকের স্বরে তিনি বললেন।

আমি বললাম, আপনাকে বলে কী হবে? ওবিষয়ে কোন কথা তোলা আমার অত্যন্ত ক্লান্তিকর। তাছাড়া, ও আমার আস্তে আস্তে কেটে যাবে। (সত্যি বলতে কি আমার মনে হল,—এ বিষাদ যে শুধু কেটে যাবে তা নয়, এ যেন ইতিমধ্যেই দূরহয়ে গেছে—শুধু কি তাই, মনে হল এ যেন আমার কস্মিন কালেও ছিল না।)

নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে না পারা তো ভাল কথা নয়? তবে বুঝি তুমি একটি ছোটখাট ভদ্রমহিলা হয়ে উঠেছ?

নিশ্চয়, তা নয় তো কী? আমি হাসতে হাসতে বললাম।

প্রশংসা করবার লোক যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই স্ফূর্তিতে থাকবে আর বাকি সময়টা মনমরা হয়ে কাটাবে, কিছুই ভাল লাগবেনা,—অন্তঃসারশূন্য এমন তরুণীকে তো প্রশংসা করতে পারছি না!

আমি বললাম, আমার সম্বন্ধে আপনার অত্যন্ত উচ্চ ধারণা। যেন একটা কিছু বলা দরকার তাই বললাম কথাটা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, হুঁ! তোমার বাবার সঙ্গে তোমার যে মিল রয়েছে, কিছু না কিছু অর্থ তার আছেই। তোমার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে…এই পর্যন্ত বলে স্নিগ্ধ, মনোযোগী দৃষ্টিতে যেভাবে তিনি আমার দিকে তাকালেন, অস্বস্তি বোধ হলেও তা আমার ভাল লাগল।

আপাতদৃষ্টিতে যে হাসিখুসি ভাব তাঁর মুখেচোখে ফুটে উঠত, তার অন্তরালে যে এক অদ্ভুত ভাবান্তরও সঙ্গোপনে রয়েছে, এই প্রথম আমি তা অনুভব করলাম। উজ্জ্বল মুখকান্তি গম্ভীর হতে হতে ক্রমশ যেন বিষণ্ণ ভাব ধারণ করল।

তিনি বললেন, সব সময় অমন মনমরা হয়ে থাকা ভাল নয়। তুমি সঙ্গীত জান, ভালবাস, গাও; বই ভালবাস, পড়। সমস্ত জীবনটাই তো তোমার পড়ে রয়েছে—নিজেকে সেজন্য প্রস্তুত করে নাও,—এই তো উপযুক্ত সময়! এখন থেকে ঠিকভাবে চললে পরে আর অনুতাপ করতে হবে না। একটা বছর নষ্ট করাও এসময়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বাবা কিংবা কাকা যেমন সুরে কথা বলেন তেমনি সুরে তিনি কথা কয়ে চললেন। প্রতিটি কথা আমার বোধগম্য করবার জন্য

যে প্রতিমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিতে হচ্ছে, এ বেশ বুঝছিলাম। আমাকে তিনি নিজের চেয়ে খাটো মনে করায় মনে একটু দুঃখ হল বটে, কিন্তু খুসি হলাম এই ভেবে যে, এ তিনি আমার জন্যই করছেন।

বাকী সন্ধ্যাটা তাঁর কাতিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়-সম্পর্কিত কথা কয়েই কাটল।

আচ্ছা, এবার বিদায়। বলে তিনি উঠে পড়লেন, কাছে এসে আমার হাতে হাত দিলেন।

কাতিয়া জিজ্ঞাসা করল,—আবার কবে আপনার দেখা পাব?

বসন্তকালে। তখনো তিনি আমার হাত ধরে রেখেছেন। এখন আমি যাব দানিলোভ্‌কায় (এও আমাদের এক সম্পত্তি), সেখানকার অবস্থা বুঝে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে যাব মস্কো—আমার নিজের কাজে। বসন্তকালে আবার আমাদের দেখা হবে।

এতদিন আপনি বাইরে থাকবেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁর এ কথা শুনে আমার অত্যন্ত বেদনা হল। আশা করেছিলাম উনি এখানে থেকে যাবেন, রোজ ওঁর দেখা পাব, তাই ওঁর এ কথায় আমি অত্যন্ত মুষড়ে পড়লাম, ভয় হল, আমার বিমর্ষ ভাব আবার বুঝি ফিরে আসবে। আমার এ মনোভাব হয়ত আমার কণ্ঠস্বরে, আমার মুখের ভাবেই ফুটে উঠেছিল।

উনি বললেন,—কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থেকো, মন খারাপ কোরো না। মনে হল যেন কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট সহৃদয়তার অভাব। বললেন, বসন্তে এসে তোমার পরীক্ষা নেব। এই বলে তিনি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

হলঘর পর্যন্ত আমরা ওঁর সঙ্গে গেলাম। তাড়াতাড়ি ফার কোটটা পরে নিলেন উনি, কিন্তু তখনো উনি সযত্নে আমার ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রেখেছেন। মনে মনে ভাবলাম, শুধু শুধুই উনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। উনি কি মনে করেন যে আমি ওঁর কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য ব্যাগ্র হয়ে পড়েছি? উনি খুব চমৎকার লোক স্বীকার করি, কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ঐ পর্যন্তই।

সেদিন কাতিয়ার সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত আমার কথা হল। তাঁর সম্বন্ধে নয়, আমাদের গ্রীষ্মকালটা কীভাবে কাটবে, শীতকালে কোথায় থাকব এবং তখন কী করব এই সব নানান কথা। সেই ভয়ঙ্কর প্রশ্ন—কী লাভ এতে?—আর আমার মনে জাগছে না, জীবনকে খুব সহজ ভাবেই নিতে পারছি; জীবনের প্রধান কাম্য যে সুখ এ বোধ আমার হয়েছে, এই আদর্শেই আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমাদের বিষাদমাখা, পুরোনো বাড়িটা যেন হঠাৎ আলোকোজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল।

বসন্ত এল। আমার বিষণ্ণভাব দূর হয়ে সেখানে দেখা দিল আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা স্বপ্নবিভল সেই আকুলতা, বসন্তের সমাগমে যার আগমন। শীতের প্রথম দিকটা যেভাবে কাটিয়েছিলাম বাকিটা আর সেভাবে কাটালাম না; পড়াশুনোর মধ্যে দিয়ে, পিয়ানো বাজিয়ে বা সোনিয়াকে পড়িয়ে শুনিয়েই কেটে গেল বাকি দিনগুলো। প্রায়ই একা-একা বাগানের পথে ঘুরে বেড়াতাম কিংবা কোন বেঞ্চে বসতাম, আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসত। কত আশা, কত আশঙ্কা আমার মনে দোল দিয়েছে। রাত্রে কখনো, বিশেষ করে

চাঁদনী রাত্রে, সকাল পর্যন্ত শুধু শোবার ঘরের জানলার ধারে বসেই কাটিয়ে দিয়েছি, কখনো বা কাতিয়ার অলক্ষ্যে শুধু একটা র‍্যাপার গায়ে দিয়েই পা টিপে টিপে বাগানে গিয়ে হাজির হয়েছি, শিশির-ভেজা পথ ধরে ছুটে গিয়েছি পুকুরের ধার পর্যন্ত। একরাত্রে তো বাগান পেরিয়ে একেবারে ফাঁকা পর্যন্ত চলে গেছলাম।

কী কী স্বপ্ন তখন আমার কল্পনায় ভিড় করে আসত, ঠিক মনে করতে বা বুঝতে পারি না। আর যদিই কখনো কোনো কিছু মনে আসে, বিশ্বাসই হতে চায় না যে ঠিক অমনধারা স্বপ্ন আমি দেখেছি। এত অদ্ভুত, এত অবাস্তব সে স্বপ্ন!

সাজি মিখায়েলিচ কথা রেখেছিলেন, মে মাসের শেষাশেষি ফিরে এলেন তিনি।

যখন তিনি আমাদের এখানে এলেন তখন সন্ধ্যা। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তিনি এসে উপস্থিত হন। আমরা বারান্দায় বসে চায়ের বন্দোবস্ত করছি। সমস্ত বাগান সবুজে ছেয়ে গেছে, সেণ্ট পিটার্স ফাস্ট যতদিন ছিল, ততদিন বাগানের পাতায় পাতায় বাসা বেঁধেছিল নাইটিঙ্গেলের দল। সুডৌল লিলাক-কুঞ্জের ওপরটা উজ্জ্বল সাদায় লালে ছাওয়া,—যা থেকে বুঝতে হবে যে ফুলগুলোর ফোটার সময় হয়েছে। সারি-দেওয়া বার্চ পল্লব অস্তসূর্যের আভায় স্বচ্ছ। বারান্দা ছায়াবহুল, তকতকে। সন্ধ্যার শিশির বেশ ঘন হয়েই ঘাসের ওপর পড়বে। বাগানের ওপারের দরজা দিয়ে ভেসে আসছে দিনান্তের শেষ কোলাহল, শোনা যাচ্ছে গরু ভেড়ার বাড়ি-ফেরার শব্দ। বোকা ছেলে নাইকন বারান্দার ওদিকের পথ দিয়ে জলের গাড়িটা আনছিল,

জল-ছিটোনোর পাইপ থেকে ঠাণ্ডা জলের ধারা ডালিয়ার গোড়ায় এসে কালো হয়ে জমছে। বারান্দায় ঝকঝকে সামোভার থেকে হিস্-হিস্ শব্দ উঠছে, আলো ঠিকরে পড়ছে সাদা টেবল-ক্লথের ওপর। টেবলের ওপর ক্র্যাকনেল, বিস্কুট আর ক্রীম সাজানো। মোটা মোটা হাতে কাতিয়া কাপ-ডিসগুলো ধোয়া-মোছা করছে। আমি স্নান করে উঠেছি, ক্ষিদের জ্বালায় আর দেরি সইছে না, চায়ের অপেক্ষা না করেই পুরু মাখন মাখিয়ে রুটি মুখে পুরছি—পরণে ঢলঢলে-হাতা ব্লাউজ, মাথার ভিজে চুলে রুমাল জড়ানো।

তিনি আসবার আগেই কাতিয়া তাঁকে দেখতে পেয়েছিল।

আপনি, সার্জি মিখায়েলিচ! বাঃ, এই তো আপনার কথাই হচ্ছিল!

পোষাক পালটাবার জন্য বেরিয়ে যাব, কিন্তু ঠিক দরজার কাছেই উনি আমাকে ধরে ফেললেন।

গাঁয়ে বাস করেও অত সামাজিকতা বজায় রাখার চেষ্টা কেন?-আমার মাথার রুমালটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে তিনি বললেন, গ্রিগরির সামনে যদি তোমার এ-বেশে আপত্তি না থাকে তো আমার সামনেই বা কেন থাকবে? আমিও তো আসলে গ্রিগরিরই মত!—কিন্তু যে ভাবে তিনি আমার দিকে তাকালেন, আর যাই হোক সে দৃষ্টি গ্রিগরির দৃষ্টি নয়। আমার অস্বস্তি বোধ হল।

এখুনি আসছি, বলে আমি বেরিয়ে গেলাম।

কেন, এ পোষাকে আপত্তি কী? বেশ তো চাষীর মেয়ের মত দেখাচ্ছিল!—আমার চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

কী অদ্ভুতভাবে উনি আমার দিকে তাকালেন! তাড়াতাড়ি

পোষাক বদলাতে বদলাতে আমি মনে মনে বললাম। যাক, উনি এসে ভালই হয়েছে, বেশ আমোদে দিন কাটবে। আয়নার দিকে একবার তাকিয়ে একদৌড়ে নিচে নেমে বারান্দায় পৌছলাম। আমি যে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, তা আমি গোপন করতে চেষ্টা করি নি। উনি টেবলে বসে কাতিয়ার সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তা বলছিলেন। ওঁর কথার ভাবে বুঝলাম, আমাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই চলেছে। কথা হল, গ্রীষ্মকালটা গ্রামে কাটিয়ে সোনিয়ার লেখাপড়ার সুবিধার জন্য পিটার্সবার্গ অথবা অন্য কোথাও স্বচ্ছন্দে যাওয়া যাবে।

কাতিয়া বলল, আপনিও যদি যেতেন আমাদের সঙ্গে! আপনি সঙ্গে না থাকলে আমরা খুব অসুবিধেয় পড়ব।

ইচ্ছে তো হয় তোমাদের সঙ্গে সারা পৃথিবীই ঘুরে আসি! কথার সুরে পরিহাস আর কিছু আন্তরিকতা মেশানো।

বেশ তো, চলুন না ঘুরেই আসা যাক পৃথিবীটা! আমি বললাম।

তিনি হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন,—আমার মায়ের, আমার কাজকর্মেরই কী হবে? যাক্, সে পরের কথা। বল শুনি কেমন কাটছে। আর মনমরা হয়ে থাকে না তো?

আমি কাজ-কর্মে ডুবে ছিলাম, মন খারাপ করিনি—আমার মুখে একথা শুনে, আর কাতিয়াও আমার কথায় সায় দেওয়ায় তিনি এমনভাবে আমাকে প্রশংসা করলেন,—যেন এ প্রশংসায় তাঁর কায়েমি অধিকার। তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁর প্রতিটি কথায় এমন স্নেহ ঝরে পড়ল, যেন তিনি ছোট ছেলেটির সঙ্গে কথা কইছেন। আমার মনে হল, এতদিন আমি যা কিছু করেছি সবই তাঁর কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুলে বলা উচিত,—ভাল যা করেছি শুধু তাই নয়, তিনি অপছন্দ

করতে পারেন এমন যা কিছু করেছি তাও খোলাখুলিভাবে তাঁর কাছে স্বীকার করা উচিত,—গির্জায় গিয়ে মানুষ যেমনভাবে অনুতাপ করে ঠিক তেমনি করেই। অতি মনোরম সন্ধ্যা; চায়ের পালা শেষ করেও আমরা কিছুক্ষণ বারান্দাতেই বসে রইলাম। কখন কথাবার্তার মধ্যে ডুবে গেছি নিজেরাই তা টের পাইনি, এমন তন্ময় হয়ে পড়েছি যে ঘরের ভেতরে চাকরবাকরদের নড়া-চড়ার শব্দ পর্যন্ত আমাদের কানে আসেনি। ফুলের সুবাস ক্রমেই ঘন হয়ে উঠেছে, চারিদিক থেকেই ভেসে আসছে নানা ফুলের মিষ্ট গন্ধ। শিশিরে ধুয়ে গেছে ঘাস। কাছেই একটা লিলাকের ঝোপ থেকে নাইটিঙ্গেলের গান শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু আমাদের কথাবার্তার শব্দে সে গান বন্ধ করল। তারায় ভরা আকাশটাও যেন অনেকটা নেমে আমাদের মাথার কাছে এসেছে।

ইতিমধ্যে কখন যে গোধূলি এগিয়ে এসেছে, লক্ষ্য করিনি; হঠাৎ একটা বাদুড় কোত্থেকে চুপচাপ এসে আমার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। কুঁকড়ে তাড়াতাড়ি দেয়ালের কাছে ঘেঁসে গেলাম, প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছি ভয়ে। বাদুড়টা তেমনি নিঃশব্দে চট্ করে সরে গিয়ে বারান্দার আধো-অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ উনি আলাপের প্রসঙ্গটা পালটে ফেললেন বললেন,—তোমাদের এই বাড়িটা কী ভালই না আমার লাগে! এই বারান্দায় বসেই যদি সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম!

বেশ তো, আপত্তিটা কিসের? কাতিয়া বলল।

হ্যাঁ, সে হলে তো আর কথাই ছিল না! কিন্তু জীবন তো আমার জন্য বসে থাকবে না চুপচাপ!

আচ্ছা আপনি বিয়ে করেন না কেন?—কাতিয়া জিজ্ঞাসা করল, স্বামী হিসেবে খুব চমৎকার হতেন আপনি।

কেন বলতো, চুপচাপ বসে থাকতে চাইছি বলে? হাসতে হাসতে তিনি বললেন, না কাতারিনা কার্লোভনা, তোমার আমার আর এখন বিয়ের বয়স নেই। বিয়ের পাত্র হিসেবে আমাকে দেখা বহুদিন আগেই সবাই ছেড়ে দিয়েছে, আর এ তথ্য আমার তাদের চেয়েও ভাল করেই জানা আছে এবং এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার পর থেকেই আমি বেশ একটা সাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।

তাঁর কথার ধরণে মনে হল, যেন তিনি নিজের মনকে বোঝাবার জন্যই কথাগুলো বলছেন; কথাগুলোয় তাঁর স্বাভাবিক সুরেরও অভাবও লক্ষিত হল।

কাতিয়া বলে উঠল, বাজে কথা। ছত্রিশ বছর বয়সের মানুষ, হঠাৎ আবিষ্কার করে বসল যে তার আর বিয়ের বয়স নেই!

তিনি বললেন, সত্যিই নেই কাতিয়া। চুপচাপ বসে থাকাই যখন মানুষের একমাত্র কাম্য তখন বুঝতে হবে, সত্যিই বিয়ের বয়স আর তার নেই। আচ্ছা, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ—বলে আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তিনি আবার বললেন,—ওর মত যাদের বয়স, বিয়ে করা তাদেরই উচিত, তোমার আমার এখন বড় জোর ওদের সুখেই সুখী হওয়া সাজে।

যে প্রচ্ছন্ন ব্যথা ওঁর কণ্ঠস্বরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, আমাকে তা ফাঁকি দিতে পারেনি। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি, কাতিয়া বা আমিও কোন কথা কইলাম না।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আচ্ছা, মনেই কর না হয়, গ্রহের

ক্রেরে এক সতেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হল—এই ধর, মাশা—মানে, মারিয়া আলেকজান্দ্রোভ্‌নার সঙ্গে। উদাহরণটা বেশ হয়েছে, হঠাৎ মনে পড়ে যেতে খুসিই হয়েছি ; এর চেয়ে ভাল উদাহরণ আর হতে পারত না।

আমি হাসলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না কেন তিনি খুসি হয়েছেন, কী তাঁর মনে পড়েছে।

বুকে হাত দিয়ে বল তো সত্যি করে, আমার দিকে তাকিয়ে যেন খেলাচ্ছলে তিনি বললেন,—এমন এক বুড়োর সঙ্গে যদি তোমার ভাগ্যকে বেঁধে হয় যায় যে কেবল বসে থাকতেই ভালবাসে, তবে কি তা তোমার পক্ষে নিতান্ত ভাগ্যবিড়ম্বনাই হবে না ? ভবিষ্যতের কত আশাই হয়ত তোমার বুকে গুঞ্জন করে চলেছে !

অত্যন্ত অস্বস্তি হতে লাগল। চুপ করে রইলাম, কী যে উত্তর দেব জানিনা।

আমি যে তোমার পাণিপ্রার্থনা করছি এমন মনে কোরনা কিন্তু, হাসতে হাসতে তিনি বললেন,—কিন্তু ঠিক করে বল তো, স্বপ্নের মধ্যে, কিংবা গোধূলির আলোয় একা বেড়াতে বেড়াতে স্বামীর যে ছবি কচিৎ কখনো তোমার মনে ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনটিই কি আমি ? সত্যি বল, সে এক পরম দুর্ভাগ্যই হবে না কি ?

দুর্ভাগ্য ঠিক না হলেও—আমি শুরু করলাম।

—বিশ্রী ব্যাপার তো বটেই ! আমার কথাটা তিনিই শেষ করে দিলেন।

হয়ত তাই। তবে, আমারও ভুল হতে পারে…

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, এই তো ! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে ও।

স্পষ্ট করে যে বলেছে, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। যাক, ভালই হল, পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। অবশ্য আমার তরফ থেকেও এটুকু বলবার আছে যে, আমার পক্ষেও তা অত্যন্ত দুঃখের হত।

কী অদ্ভুত আপনি! বলে কাতিয়া খাবারের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

কাতিয়া চলে যেতে আমরা দুজনে চুপ করে রইলাম। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, কেবল কোথায় একটা নাইটিঙ্গেলের গান শোনা যাচ্ছে। নাইটিঙ্গেলটা কাল রাত্রে মাঝে মাঝে গেয়ে উঠেছিল, কিন্তু আজ তার গানের জোয়ারে সমস্ত বাগান প্লাবিত হয়ে গেল। নীচের কোন্ এক গহ্বর থেকে তার এ গানের প্রত্যুত্তর ভেসে এল; এ গান যে গাইল এর আগে তার গলা শোনা যায়নি। কাছের পাখিটা থেমে পড়ে যেন এক মুহূর্ত কান পেতে কি শুনল, তারপর আবার সারা প্রাণ নিয়ে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল। কী এক রাজকীয় প্রশান্তি পাখিদুটোর গলায় বাসা বেঁধেছে! রাত্রির রাজ্যে যেখানে তাদের গান ভেসে চলেছে, সে রাজ্যে মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। মালী তার শয়নকক্ষে চলে গেল, তার ভারী বুটের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। পাহাড়ের নিচে থেকে দুবার শীষ দেবার শব্দ ভেসে এল, তারপরই সব স্তব্ধ। শুধু কানে আসছে পাতার মর্মর···একটা মৃদু গন্ধ বাতাসে ভর করে এসে বারান্দায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। যেসব কথাবার্তা হচ্ছিল তার পর চুপ করে থাকা অস্বস্তিকর, কিন্তু কী যে বলব জানিনা। ওঁর দিকে তাকালাম; চোখ দুটো আধো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। আমার দিকে ফিরে উনি বললেন, সত্যি, জীবন কী সুন্দর!

কেন জানিনা, আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলাম।

তুমি কী বল?

হ্যাঁ, জীবন সুন্দর বৈকি। তাঁর কথার পুনরুক্তি করলাম।

আবার নীরবতা, আবার সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। উনি বুড়ো হয়ে গেছেন একথা স্বীকার করে ওর মনে যে আঘাত দিয়েছি, এ চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারলাম না। ইচ্ছা হল ওঁকে সান্ত্বনা দিই, কিন্তু কী বলে সান্ত্বনা দেব!

এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে, এই বলে তিনি উঠলেন—ডিনারের সময় হল, মা আমার জন্য বসে আছে। সারাদিন মায়ের সঙ্গে দেখাই হয়নি।

বিদায়!

আমি যে ওঁর মনে আঘাত দিয়েছি, কিছুতেই এ ধারণা মন থেকে দূর করতে পারলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কাতিয়া আর আমি ওঁকে এগিয়ে দেবার জন্য সিঁড়ি পর্যন্ত গেছলাম, সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল, বারান্দায় ফিরে এসে বসলাম। তাকিয়ে রইলাম বাগানের দিকে। যা দেখতে বা শুনতে চেয়েছিলাম তখনো তা দেখা যাচ্ছিল, কানে আসছিল। শিশিরমাখা কুয়াসার মধ্যে কোলাহলমুখর রাত্রির এই রূপ অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করলাম।

দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও তিনি এলেন, প্রথম সাক্ষাৎকারের সেই আড়ষ্টতা কোথায় অন্তর্হিত হল। সেই গ্রীষ্মে সপ্তাহে দুবার, এমন কি তিনবার পর্যন্ত তিনি এসেছিলেন; তাঁর উপস্থিতিতে আমি

এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম যে যদি বা কখনো তিনি সময়মত না আসতেন তো আমার ভাল লাগত না,—রাগ হত, মনে হত, আমার কাছে না এসে তিনি অন্যায় করেছেন। তিনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন, যেন আমি তাঁর প্রিয় কোন ছোট্ট মানুষটি। তিনি আমাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করতেন, মন খুলে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে বলতেন,—কত উপদেশ, উৎসাহ দিতেন, কত ভৎসনা করতেন, কত বিষয়ে নিরুৎসাহ করতেন! যতই তিনি আমার স্তরে নেমে আসবার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁকে যেটুকু বুঝিতে পারি তার অন্তরালে রয়েছে রহস্যের অন্তঃপুর, সেখানে আমার প্রবেশের অধিকার নেই। অনেকটা এই ব্যাপারের জন্যই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা, আমার আকর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। কাতিয়ার কাছে, আমাদের প্রতিবেশীদের কাছেও শুনেছি, বুড়ি মায়ের সেবা আর তাঁর নিজের আর আমাদের বিষয়-সম্পত্তির তদারক করা ছাড়াও জনহিতকর এমন অনেক কাজও তাঁকে করতে হত যেজন্য তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কিন্তু সে সব ব্যাপারে তাঁর কী অভিমত, কী আশা আশঙ্কা— তার কোন আভাসই আমরা কখনো তাঁর কাছ থেকে পাইনি। যখনি এসব বিষয়ে কোন কথা উঠেছে, অদ্ভুতভাবে তিনি ভ্রূ কুঁচকে উঠেছেন, যেন বলতে চান,—থামো থামো, তোমাকে আর এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না! এবং পরক্ষণেই তিনি অন্য প্রসঙ্গ তুলতেন। তাঁর এই ব্যবহারে প্রথমটা আমি অবাক হতাম সত্যি, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এ আমার গা-সওয়া হয়ে গেল, তাঁর ইচ্ছামত কথাবার্তা আমার নিজের বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখতে অভ্যস্ত হলাম, এবং ক্রমে এও আমার পরম স্বাভাবিক বলেই মনে হল।

প্রথমটা খারাপ লাগলেও পরে ভাল লেগেছে—এমন আর একটা ব্যাপারের উল্লেখ করছি। আমার দৈহিক রূপের সম্বন্ধে তিনি নিতান্ত উদাসীন ছিলেন, এতে যেন বরং বিতৃষ্ণাই জাগত তাঁর। আমি যে সুন্দরী, তাঁর কোনো কথায় বা চোখের ভাষায় ভুলেও কখনো তার কোন আভাস পাওয়া যায়নি। যখনি তাঁর সামনে আমার সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ উঠেছে, তিনি ভ্রূ কুঁচকে হেসেছেন। এমন কি, আমার চেহারায় খুঁত আবিষ্কার করতে, তা নিয়ে আমাকে ক্ষ্যাপাতেই যেন তাঁর ভাল লাগত। কখনো কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে যদিবা কাতিয়া আমাকে ভাল পোষাক পরিয়ে দিত, ভাল করে চুল বেঁধে দিত, তিনি বিদ্রূপ করে উঠতেন। কোমলহৃদয় কাতিয়া এতে কষ্ট পেত, প্রথম প্রথম আমিও আশ্চর্য বোধ করতাম। কাতিয়ার ধারণা ছিল তিনি আমাকে ভালবাসেন, তাই সে বুঝতে পারত না,—প্রিয়পাত্রকে সুন্দব পোষাকে দেখে পছন্দ করে না, কেমনধারা পুরুষ এ! অবশ্য তিনি কি চান বুঝতে আমার দেরি হয়নি। আমার মধ্যে যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই, এবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে চান। ওঁর এ মনোভাব বোঝবার পর থেকেই আর আমার কোনো ব্যাপারেই কিছুমাত্র কৃত্রিমতা রইল না—না পোষাক পরিচ্ছদে, না কেশ-বিন্যাসে, না চলনে-বলনে। কিন্তু এর পরিবর্তে যে কৃত্রিমতা আমাকে আশ্রয় করল, এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তা! সে কৃত্রিমতা সরলতার অভিনয় মাত্র,—কারণ তখনো আমি সত্যিকার অনাড়ম্বর হয়ে উঠতে পারিনি। জানি উনি আমাকে ভালবাসেন; কিন্তু সে ভালবাসা ছোট মেয়ের প্রতি ভালবাসা না নারীর প্রতি ভালবাসা, এ প্রশ্ন তখনো নিজেকে করিনি। তাঁর প্রেম

আমার কাছে ছিল অত্যন্ত মহার্ঘ। পৃথিবীর অন্যান্য তরুণীদের চেয়ে যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, এও আমার অজানা ছিল না, এবং আমার সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা তাঁর চিরস্থায়ী হোক, এই বাসনা আমি প্রাণপণে পোষণ করতাম। প্রতারণার ইচ্ছা না থাকলেও সরলতার অভিনয় করে আমি তাঁকে প্রতারণা করলাম, এবং এই প্রতারণার মধ্যে দিয়েই আমার উন্নতি হতে লাগল। মনে হল, আমার হৃদয়ের যা কিছু সম্পদ শুধু তাই তাঁকে দেখানো উচিত, দৈহিক সম্পদ নয়। আমার কেশ, হাত, মুখ, চলা-ফেরা—ভাল মন্দ যাই হোক, এসব তো তাঁর ভাল করেই জানা আছে, সুতরাং তাদের সুন্দরতর দেখিয়ে তাঁকে প্রতারণা করতে যাওয়ায় ধরা পড়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু আমার অন্তরের পরিচয় যে তিনি পাননি তার কারণ, আমার হৃদয়-মন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। পরিচয় না পাবার আর একটা কারণ, আমার অন্তর তখনো উৎকর্ষের পথে। তাই কেবল এই একমাত্র ক্ষেত্রেই তাঁকে প্রতারণা করা আমার পক্ষে সম্ভব। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর সঙ্গ আমার পক্ষে সহজ হয়ে উঠল, কোথায় ঘুচে গেল অকারণ লজ্জা, চলা-ফেরার আড়ষ্ট ভঙ্গি। সামনে থেকে, পাশ থেকে, দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা বসা অবস্থায়, চুল-বাঁধা অথবা এলো-চুলে—যে ভাবেই তিনি আমাকে দেখুন না কেন, আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কিছুই তাঁর অজানা নয়; এবং যে-কোনো ভঙ্গিতেই তিনি সন্তুষ্ট। হঠাৎ যদি কখনো তিনি তাঁর অভ্যাস ভুলে আমার মুখকান্তির প্রশংসা করে বসেন, হয়ত তা আমার আদৌ ভাল লাগবে না। বরং আমার কোনো কথার উত্তরে যখন তিনি কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মনের আবেগ গোপন রেখে ঠাট্টার সুরে বলতেন,—

হাঁা, তোমার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বৈকি, খাসা মেয়েটি তুমি,—বেশ ভাল লাগত আমার, মনটা হালকা হয়ে যেত।

এই যে তিনি আমার মন গর্বে, আনন্দে ভরিয়ে দিতেন, এ কেন, কিসের আমার এ পুরস্কার? আমি হয়ত শুধু বলেছি যে ছোট নাতনিটির প্রতি গ্রিগরির স্নেহ আমাকে অভিভূত করেছে, কিংবা কোন কবিতা বা উপন্যাস পড়ে আমার চোখে জল এসেছে; অথবা হয়ত এই মন্তব্যের জন্য যে, স্কুলহফের (schulhof) চেয়ে মোজার্টকেই আমার বেশী পছন্দ। কোন্ জিনিষ ভাল, কোন্ জিনিষ বাঞ্ছনীয়,—এ-বিষয়ে কোনো ধারণা করতে আমার এত অল্প সময় লাগত যে আমি নিজেই আশ্চর্য হতাম; কারণ ভালমন্দ বিচারের যথেষ্ট বোধ তখনো আমার মধ্যে জাগেনি। আমার পুরোনো রুচি বা অভ্যাসের অনেক কিছুই তাঁর পছন্দ হত না। আমার কথা যদি তাঁর ভাল না লাগত তো আমাকে তা বুঝিয়ে দেবার জন্য সামান্য একটা দৃষ্টিক্ষেপ, ভ্রূর ঈষৎ কম্পনই হত যথেষ্ট, বুঝতাম, যে স্তরে এতক্ষণ কথাবার্তা হচ্ছিল তা থেকে নেমে এসেছি। হয়ত কখনো তিনি আমাকে কিছু উপদেশ দিতে চাইছেন, আগে থেকেই আমি বুঝতে পারতাম তিনি কী বলবেন। আমার দিকে তাকিয়ে যখনি তিনি কিছু প্রশ্ন করতেন, তাঁর চোখের দৃষ্টিই যেন আমার ভেতর থেকে সে প্রশ্নের উত্তর বের করে নিত। আমার তখনকার যা কিছু চিন্তাধারা, যা কিছু অনুভূতি, তার কিছুই আমার নিজস্ব নয়, সমস্তই তাঁর চিন্তা, তাঁরই অনুভূতি—হঠাৎ যেন তারা একান্ত আপনার হয়ে আমার জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই সমস্ত জগত আমার সামনে নতুন রূপ পরিগ্রহ করল,—কাতিয়া, সোনিয়া, ভৃত্যের দল, এমন কি আমি নিজে, আমার

কর্মপদ্ধতি পর্যন্ত। আগে বই পড়তাম শুধু একঘেয়েমি দূর করবার জন্য, আজকাল বইই আমার আনন্দের প্রধান উৎস, কারণ বই তো আনেন তিনিই—সে বই দুজনে একসঙ্গে পাঠ করি, আলোচনা করি। সোনিয়াকে পড়ানো এতদিন আমার এক অত্যন্ত বিরক্তিকর দায় বলেই মনে হত—যা না করলেই নয়। কিন্তু সোনিয়াকে পড়াবার সময় সেই যে একদিন তিনি উপস্থিত ছিলেন, সেই থেকে সোনিয়ার পড়াশুনোয় যে উন্নতি হয়েছিল তা দেখে আমি উল্লসিত হয়েছিলাম। একটা গান পূরো মনে রাখা যেন আমার পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হত। কিন্তু আজকাল যখন ভাবি এ গান তিনি শুনবেন, হয়ত প্রশংসা করবেন,—একটা কলি দরকার হলে চল্লিশবার পর্যন্ত অভ্যাস করতে দ্বিধা করিনা। বেচারা কাতিয়া হয়ত শেষ পর্যন্ত কানে তুলো দিতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু তবুও আমার ক্লান্তি নেই। পুরোনো সোনাটাগুলো যেন নতুন ব্যঞ্জনায় অনেক সুন্দর হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। এতদিনের পরিচিত প্রাণতুল্য প্রিয় কাতিয়া পর্যন্ত যেন আমার চোখে নতুন হয়ে উঠল। এই যে সে আমাদের মা হয়ে, বন্ধু হয়ে, দাসী হয়ে জীবনযাপন করছে, এই যে তার একমাত্র ললাটলিপি নয়,—অন্য ভাবে জীবনধারণের উপায়ও যে তার আছে, এ সত্য এই প্রথম আমার মধ্যে প্রতিভাত হল। দয়ায় মায়ায় ভরা এই মানুষটির আত্মত্যাগ আর ভালবাসার উপলব্ধি এতদিনে আমার হল, বুঝলাম, অনেক দিক দিয়েই আমরা তার কাছে ঋণী; এবং ফলে তার প্রতি আমার ভালবাসাও অনেকাংশে বর্ধিত হল। দাসদাসীদের প্রতি আমার নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর মূলেও তাঁরই শিক্ষা। হয়ত অসম্ভব মনে হবে যদি আমি বলি যে, সতেরো বছর এদের সঙ্গে বাস করা সত্ত্বেও এদের সম্বন্ধে আমি সামান্য যেটুকু জানি, যে-কোন অপরিচিত

ব্যক্তি সম্বন্ধেও হয়ত আমার জ্ঞান তার চেয়ে বেশী। তাদেরও যে আমার মত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, একথা এতদিন আমার একবারও মনে হয়নি। আমাদের বহুপরিচিত বাগান, বনপ্রান্তর, সব যেন হঠাৎ নতুন হয়ে, সুন্দর হয়ে আমার চোখে ধরা পড়ল। ঠিকই বলেছেন তিনি,—মানুষের জীবনে একমাত্র সুখ হল নিঃশেষে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। তাঁর এই সব কথা প্রথম প্রথম আমার অদ্ভুত মনে হত, বুঝতেও পারতাম না ঠিক; কিন্তু ক্রমে তা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে উঠল, বিনা বাধায় আমি সব মেনে নিতে লাগলাম। জীবনের ধারায় কিছুমাত্র পরিবর্তন না এনেও এক অখণ্ড আনন্দের জগতে তিনি আমাকে পৌঁছে দিলেন, আমার প্রতিটি ধারণার মধ্যে শুধু নিজের সত্তাকে ব্যাপ্ত করে দিয়েই এ অসাধ্য সাধন করলেন তিনি। শৈশবের উন্মেষ থেকে যা কিছু এত কাল আমাকে ঘিরে মৌন ছিল, হঠাৎ আজ তা প্রাণ পেয়েছে। শুধু তাঁর দৃষ্টির ছোঁয়ায় সমস্ত কিছু আমার মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে, সুখের আবেশে বুক ভরিয়ে দিয়ে প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

গ্রীষ্মের রাতে এমন অনেকবার হয়েছে, ওপরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছি,—বসন্তের সেই বিষাদ, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ঘুচে গিয়ে মনে দেখা দিয়েছে বর্তমানের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা। ঘুমোতে না পেরে কাতিয়ার বিছানায় গিয়ে বসেছি, আমার এই পরম সুখের কথা তাকে শুনিয়েছি—যদিও অবশ্য আজ বুঝেছি যে তার কোন প্রয়োজন হত না, কারণ আমার কথায়-বার্তায় ইতিমধ্যেই সে তা টের পেয়েছিল। কিন্তু মুখে সে বলত শুনে সুখী হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে। ওর কথা আমার বিশ্বাস হয়েছে,

কারণ আমার তখনকার ধারণা, আমার মত প্রত্যেকেরই অমন সুখী হওয়াই উচিত। কিন্তু কাতিয়ার তো ঘুমেরও দরকার,—মাঝেমাঝে তাই ক্রোধের ভাণ করে সে আমাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। মনে মনে চিন্তা করতাম, এই যে এত সুখ, এ আমার কিসের? কখনো বা উঠে পড়তাম, আবার নতুন করে প্রার্থনা করে আমার এই সুখের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতাম।

ঘরে কোন শব্দ নেই শুধু ঘুমন্ত কাতিয়ার সুসম নিশ্বাসপ্রশ্বাসের, আর তার বিছানার কাছে রাখা ঘড়িটার টিকটিক্ শব্দ ছাড়া। আমি তখন এপাশ-ওপাশ করছি, প্রার্থনার কথাগুলো ফিসফিস করে আউড়ে চলেছি, দরজা বন্ধ রয়েছে, জানলার শার্সি টানা; একটা মাছি না ডাঁশ শুধু বাতাসে ভনভন করছে। ইচ্ছা হল, এঘর থেকে যেন আমাকে বেরোতে না হয়, ইচ্ছা হল ভোর যেন না আসে, ইচ্ছা হল, আমার মনের এই অবস্থা যেন চিরন্তন হয়। মনে হল আমার স্বপ্ন, আমার চিন্তা, আমার প্রার্থনা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আমার সঙ্গে তারাও যেন জেগে রয়েছে এই অন্ধকারের বুকে, আমার বিছানার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার ওপরে। আমার যাকিছু চিন্তা সব তাঁর চিন্তা, প্রতিটি অনুভূতি পর্যন্ত তাঁরই অনুভূতি। এরই নাম যে প্রেম, এ উপলব্ধি তখন আমার হয়নি। ভেবেছিলাম, এই অবস্থাই হয়ত চিরন্তন হয়ে থাকবে, অন্য কোন পরিণতিই আর এর সম্ভব নয়।

তখন ফসল কাটবার সময়, কাতিয়া আর সোনিয়ার সঙ্গে একদিন বাগানে আমাদের প্রিয় জায়গাটায় গিয়ে বসেছি। জায়গাটার নিচে একটা উপত্যকা, লাইম গাছের ছায়া সেখানে এসে পড়েছে। সামনে বিস্তীর্ণ গাছপালায় ছাওয়া প্রান্তর। সার্জি মিখায়েলিচ তিনদিন

আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, আজও আমরা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছি,—বিশেষ আরো এই কারণে যে খবর পেয়েছি তিনি শস্যক্ষেত্র পরিদর্শনে আসবেন। বেলা দুটোর সময় আমরা তাঁকে দেখলাম, ঘোড়ায় চড়ে রাই ক্ষেতের দিকে এগিয়ে আসছেন। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে কাতিয়া পিচ আর চেরি আনাবার ব্যবস্থা করল, কারণ ওদুটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তারপর সেই বেঞ্চে শুয়ে ঢুলতে শুরু করল। লাইম গাছ থেকে একটা বেঁকানো চেপ্টাগোছের ডাল আমি ভেঙে নিলাম,—পাতার রসে, গাছের ছালের রসে হাত ভরে গেল। সেটা দিয়ে কাতিয়াকে বাতাস করতে করতে আবার পড়ায় মন দিলাম। পড়ি, আর থেকে থেকে পথের দিকে তাকাই, যে পথ ধরে তিনি আসবেন। একটা পুরোনো লাইম গাছের ছায়ায় বসে সোনিয়া পুতুলের বাড়ি তৈরি করছিল। অত্যন্ত গুমোট পড়েছে, একটুও বাতাস বইছে না। মেঘ ক্রমে ঘন, কালো হয়ে উঠছে, সারা সকাল ধরে ঝড়-বজ্রপাতের পূর্বাভাস। অত্যন্ত অস্বস্তি হতে লাগল, ঝড়ের আগে আমার যেমনটি হয়। কিন্তু বিকেলের দিকে মেঘ হালকা হয়ে এল, পরিষ্কার আকাশে সূর্যের খেয়া শুরু হল,—আকাশের এক সুদূর কোন্ থেকে শুধু ভেসে আসছে মেঘগর্জ্জনের অস্পষ্ট শব্দ। একটা ভারী মেঘ মাঠের ধূলো মেখে দিগন্তরাল রেখার ওপর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল, সেই মেঘ চিরে মাঝেমাঝে মাটিতে নেমে আসছিল পাণ্ডুর বিদ্যুতের বঙ্কিম রেখা। বোঝা যাচ্ছে, আমাদের এ অঞ্চলে অন্তত আজকের মত ঝড়টা কেটে যাবে। বাগানের ওপারে পথ, সেই পথের দুয়েকটা জায়গা আমার চোখে পড়ছে। একসার গাড়ি আঁটিবাঁধা ফসল নিয়ে সে পথে চলেছে, আর কয়েকটা

খালি গরুর গাড়ি শব্দ করতে করতে ঐ গাড়িগুলোর দিকে আসছে। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করতে করতে, অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে এই গাড়িগুলো চলেছে; গাড়োয়ানের পা দুলছে, শার্ট হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। ধুলোর পুরু আস্তরণ জমাট হয়ে রয়েছে, উড়ে যাচ্ছে না, থিতিয়েও পড়ছে না,—বেড়ার ওপারে স্থির হয়ে রয়েছে। স্বচ্ছ সবুজ পল্লবের ফাঁক দিয়ে এ সমস্তই চোখে পড়ছে। একটু দূরে গোলাবাড়ি, তার কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে কথাবার্তার আর গাড়ি চলার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। হলদে ফসলের যে গাড়িগুলো এতক্ষণ বেড়ার পাশ দিয়ে মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, এখন তারা ছুটে চলেছে। ফসলের স্তূপ গোল করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, ওপর দিকটা ক্রমে সরু হয়ে উঠে গেছে। চাষীদের কর্মব্যস্ততার লক্ষণও চোখে পড়ল। ধুলোয় ভরা মাঠে আরো অনেক গাড়ি দেখা যাচ্ছে, আরো অনেক ফসল। গাড়ির শব্দ, মানুষের কথাবার্তা আর গানের শব্দ মিশে দূর থেকে আমাদের কানে আসছে। একদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু ফসলের নাড়া ক্ষেত, আর মাঝে মাঝে পোকাধরা, আবাদ না-করা খানিকটা করে পতিত জমি। আরো নিচে, ডান দিকে রঙচঙে পোষাক পরা স্ত্রীলোকদের দেখা যাচ্ছে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফসলের আঁটি বাঁধছে। এই নাড়া ক্ষেত প্রথমটা এলোমেলো দেখাচ্ছিল, কিন্তু খানিকটা করে ছেড়ে ছেড়ে আঁটিবাঁধা ফসল সেখানে সাজাতেই এ এলোমেলো ভাব কিছুক্ষণের মধ্যেই কেটে গেল। আমার চোখের সামনেই যেন গ্রীষ্ম হঠাৎ শরতে রূপান্তরিত হল। সর্বত্র ধুলো আর তাত, কেবল আমাদের ছায়ায় ঘেরা প্রিয় জায়গাটি ছাড়া। চারিদিকের এই ধুলো আর উত্তাপের মধ্যে, এই জ্বলন্ত

রোদেও চাষীরা কথা কইতে কইতে এই আয়াসসাধ্য কাজ করে চলেছে।

ছায়াঘন বেঞ্চে শুয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাতিয়া মিষ্টি ঘুম ঘুমোচ্ছে। রসে ভরা চেরিগুলো প্লেটের ওপর ঝকমক করছে, লোভ হচ্ছে দেখে। আমাদের পরনের পোষাক সুন্দর, ধবধবে পরিষ্কার। সূর্যের আলো জগের জলে পড়ে রামধনু রঙ এঁকে দিয়েছে। সমস্ত মিলে কি ভালই না আমার লাগছে! ভাল না লেগে কি উপায় আছে? আমার এ সুখ আমি কারো সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই, কিন্তু কার সঙ্গে ভাগ করি? কী ভাবে, কার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করি, আমার সমস্ত সুখ কার হাতে তুলে দিই?

ইতিমধ্যে সারি-দেওয়া বার্চ গাছের ওপর দিয়ে সূর্য অস্ত গেছে, ধূলো মাঠে জমেছে। আলোর তীর্যক রেখায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। সমস্ত মেঘ কোথায় চলে গেছে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি নতুন তৈরি তিনটে গোলাঘর। চাষীরা গোলা থেকে নেমে আসছে।···গাড়িগুলো তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে দৃষ্টির বাইরে—এই ওদের শেষ যাওয়া। গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে মেয়ের দল চলে যাচ্ছে,—কাঁধে বোঝা, কোমরে খড়ের বাণ্ডিল।

কতক্ষণ হল সার্জি মিখায়েলিচকে ঘোড়ায় চলে পাহাড়-পথে নেমে আসতে দেখেছি, কিন্তু তারপর এতক্ষণেও আর তাঁর দেখা নেই। গাছের সারি দেওয়া পথে হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলাম,—যেদিক দিয়ে শেষ পর্যন্ত এলেন সেদিকে তাঁকে আশা করিনি। খাদের দিক থেকে কিছুটা ঘুরে তিনি এলেন।

হ্যাট খুলে, উদ্দীপনায় উদ্ভাসিত মুখে তিনি আমার কাছে এলেন।

কাতিয়াকে ঘুমন্ত দেখে ঠোঁট কামড়ালেন, চোখ বুজে, পা টিপে টিপে খুব সন্তর্পণে এগিয়ে এলেন,—সেই অদ্ভুত, অকারণ পুলক তাঁর মধ্যে জেগে উঠছে যা আমার খুব ভাল লাগত, যার আমরা নাম দিয়েছিলাম, 'বন্য উন্মাদনা'। ভাবটা ঠিক যেন ইস্কুল-পালানো ছেলের মত; সমস্ত দেহের মধ্যে তৃপ্তি ফুটে উঠেছে; সুখের আমেজে সারা মন ভরপুর।

কি গো ছোট্ট ভায়োলেটটি, কেমন, ভাল আছ তো? কাছে এসে আমার হাত ধরে ফিসফিস করে তিনি বললেন। তারপর আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ওঃ, আজ আমি খুব ফুর্তিতে আছি,—ঠিক যেন তেরো বছরের ছেলেটি হয়ে গেছি!—ইচ্ছে করছে—ঘোড়া-ঘোড়া খেলি, গাছে চড়ি!

এই বুঝি বন্য উন্মাদনার লক্ষণ? ওঁর হাসি-হাসি চোখে চোখ রেখে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে করতে অনুভব করলাম, এ বন্য উন্মাদনার ছোঁয়াচ আমারও লেগেছে।

চোখ টিপে, হাসি গোপন করে সার্জি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু তা বলে তুমি কাতিয়ার নাকে মারবে কেন শুনি?"

আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে অন্যমনে গাছের ডালটা দোলাচ্ছিলাম, কখন্ যে গাছের পাতা লেগে কাতিয়ার মুখের ওপর থেকে রুমালটা সরে গেছে, টের পাইনি। পাতাগুলো তখনো কাতিয়ার মুখের ওপর বুলিয়ে যাচ্ছিল।

আমি হেসে উঠলাম।

কাতিয়া জেগে ঠিক বলবে সে একটুও ঘুমোয় নি,—ফিসফিস করে কথাটা আমি বললাম, যাতে কাতিয়ার ঘুম ভেঙে না যায়। কিন্তু

ফিসফিস করার আসল কারণ তা নয়, আসল কথা হল, ফিসফিস করে কথা বলতেই তখন আমার ভাল লাগছিল।

আমার অনুকরণে তিনিও ঠোঁট নাড়লেন, এমন ভাব দেখালেন, যেন আমার মৃদু স্বর তাঁর কানে পৌছয়নি। এমন সময় চেরির প্লেটটা তাঁর চোখে পড়ল। তিমি এমন ভাবে সেটা তুলে নিলেন যেন চুরি করছেন, তারপর লাইম গাছের নিচে সোনিয়ার কাছে গিয়ে তার পুতুলগুলোর ওপর বসে পড়লেন। সোনিয়া প্রথমটা রেগে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা খেলা ফেঁদে তিনি তার সঙ্গে ভাব করে ফেললেন। খেলাটা হল, কে কত তাড়াতাড়ি চেরিগুলো খেতে পারে।

আমি বললাম, বলেন তো আরো চেরি আনিয়ে নিই, কিংবা আমরাই বাড়ির ভেতরে যাই চলুন।

সাজি পুতুলগুলোকে প্লেটের ওপর করে নিলেন, আমরা তিনজন কুঞ্জের দিকে চললাম। হাসতে হাসতে, ওঁর কোট ধরে টানতে টানতে সোনিয়া আমাদের পিছু পিছু ছুটছে। পুতুলগুলো তিনি ওকে দিয়ে দিলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে একটু গম্ভীর স্বরে কথাবার্তা শুরু করলেন।

বললেন, সত্যিই তুমি ভায়োলেট—তখনো তেমনি ফিসফিস করে কথা কইছেন। বললেন, ঐ ধুলোর রাজ্যে, এই গরমের মধ্যে চাষীদের পাশ দিয়ে আসতে আসতে সত্যিই আমি ভায়োলেটের গন্ধ পাচ্ছিলাম। মিষ্টি ভায়োলেটের গন্ধ এ নয়, এ ভায়োলেট প্রথম বসন্তের ঘোর রঙের ভায়োলেট ; এতে আছে গলা-তুষারের গন্ধ, আছে বসন্তী তৃণের সৌরভ।

তাঁর কথায় আমার মনে এক মধুর আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল ; কিন্তু তা গোপন করার উদ্দেশ্যে আমি বলে উঠলাম, ফসল কাটার কাজ কেমন হচ্ছে, বেশ ভাল তো ?

চমৎকার ! আমাদের লোকেরা সকলেই খুব ভাল ; দেখো, যতই ওদের দেখবে ততই ভাল লাগবে।

তা বটে। আপনি আসবার আগে আমি বাগান থেকে ওদের লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎ আমার কেমন লজ্জা হল—আমি এত সুখে আছি, আর ওরা কত কষ্ট করছে—এত—

গম্ভীর, স্নিগ্ধ দৃষ্টি গিয়ে তিনি আমাকে বাধা দিলেন, বললেন, অমন করে কথা কয়োনা, লক্ষ্মীটি ! এমন পবিত্র বিষয় নিয়ে অত হালকা আলোচনা উচিত নয়। ঈশ্বর করুন, এ বিষয়ে যেন গালভরা সুন্দর সুন্দর কথা তোমার কাছ থেকে শুনতে না হয় !

কিন্তু এ তো শুধু আপনার কাছেই বলছি !

ও, আচ্ছা।—কিন্তু চেরির কী হল ?

কুঞ্জ চাবিবন্ধ, মালীরও দেখা নেই। সকলকেই তিনি ফসল কাটার কাজে পাঠিয়েছেন। সোনিয়া চাবি আনতে ছুটল, কিন্তু অতটা দেরি তাঁর সইল না ; দেয়ালের এক কোন্ বেয়ে উঠে, জাল সরিয়ে ভেতরে লাফিয়ে পড়লেন।

দেয়ালের ওপর থেকে তাঁর কথা শোনা গেল,—তুমিও কিছু চাও তো প্লেটটা দাও।

না, আমার আমি নিজেই পেড়ে নেব। যাই চাবিটা আনি গিয়ে, সোনিয়া খুঁজে পাবে না।

হঠাৎ আমার ইচ্ছা হল, দেখি উনি ওখানে কী করছেন,—

ওঁর হাবভাব লক্ষ্য করব, অথচ উনি জানতেও পারবেন না যে কেউ ওঁকে লক্ষ্য করছে। আর তা ছাড়াও, এক মুহূর্তের জন্যও ওঁকে চোখের আড়াল করতে তখন আমার মন সরছিল না। কুঞ্জের অপর দিকে যেখানে পাঁচিলটা নিচু, হালকা পায়ে সেখানে গেলাম। তারপর একটা খালি বাক্সের ওপর দাঁড়াতেই পাঁচিলটা আমার কোমর সমান হল। সেখান থেকে ঝুঁকে কুঞ্জের বুড়ো গাছগুলোর দিকে তাকালাম। প্রচুর পত্র-পল্লব আর পাকা কালো কালো ফলে গাছগুলো ভরে রয়েছে, ফলগুলো ভারী হয়ে ঝুলে পড়েছে। তারপর জালের তলা দিয়ে মাথা গলিয়ে একটা শাখাবহুল গাছের নিচে সার্জি মিখায়েলিচকে দেখলাম। ওঁর নিশ্চয় স্থির ধারণা আমি চলে গেছি, কেউ ওঁকে লক্ষ্য করছে না। হ্যাট খুলে, চোখ বুজিয়ে উনি একটা বড় গাছের গোড়ায় বসে খুব মন দিয়ে চেরির আঠা দিয়ে একটা বল পাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ঘাড় নেড়ে উঠলেন, চোখ খুললেন; বিড় বিড় করে কি বলে মৃদু হাসলেন। এই ভাবে কথা কওয়া আর এমন হেসে ওঠা এতই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ যে, এভাবে আড়ি পাতার জন্য আমার লজ্জা করতে লাগল। উনি যেন বললেন মনে হল,—মাশা! অসম্ভব! আমি চিন্তাগ্রস্ত হলাম।

আবার তিনি বলে উঠলেন, প্রিয় মাশা!—আরো আস্তে, আরো নরম স্বরে বললেন। এবারে আর আমার শুনতে কোনো ভুল হয়নি। আমার হৃদ্‌স্পন্দনের গতি দ্রুত হল; এমন এক আনন্দোচ্ছ্বাস আমাকে পেয়ে বসল যা আমার অপরাধ বলেই মনে হল। তাড়াতাড়ি দেয়ালটা ধরে ফেললাম, পাছে পড়ে গিয়ে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু আমার নড়াচড়ার শব্দেই উনি চমকে ফিরে তাকালেন।

সঙ্গে সঙ্গে ওঁর দৃষ্টি আনত হল, সমস্ত মুখ ছোট ছেলেটির মত টকটকে লাল হয়ে উঠল। কথা কইতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কথা এল না, মুখের রঙ বারবার রক্তিম হয়ে উঠতে লাগল। তবুও তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন, আমিও হাসলাম। পরক্ষণেই সুখের অভিব্যক্তিতে তাঁর সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আস্কারা-দেওয়া, ধমক-দেওয়া এতদিনের গুরুজনটি আর তিনি নন, তিনি এখন আমার স্তরে নেমে এসেছেন। আমি যেমন তাঁকে ভালবাসি, ভয় করি, তিনিও তেমনি আমাকে ভালবাসেন, ভয় করেন। পরস্পরের দিকে আমরা নির্বাক তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল, হাসি থেমে গেল, চোখের আলো নিবে গেল; সেই গুরুজনসুলভ শান্ত সুরে আবার কথা শুরু করলেন—যেন এমন একটা ভয়ানক অন্যায় আমরা করেছি যেজন্য তিনি নিজে অনুতাপ করছেন আর আমাকেও অনুতাপ করতে বলছেন।

বললেন, নেমে যাও ওখান থেকে, নইলে পড়ে যাবে। চুলগুলো ঠিক করে নাও—ভেবে ছাখ তো কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে!

এ ছলনা কেন? কেন আমাকে কষ্ট দেবার এই চেষ্টা? বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ওঁর প্রশান্তি ভেঙে দেবার, ওঁর ওপরে আমার ক্ষমতা পরীক্ষার এক অদম্য বাসনা আমার মনে জেগে উঠল।

না,—মানে, আমি নিজের হাতেই কয়েকটা পেড়ে নিতে চাই কিনা! বলে কাছের একটা ডাল ধরে পাঁচিলের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় চলে গেলাম, আর ধরবার বিন্দুমাত্র সময় তাঁকে না দিয়েই পাঁচিলের অপর পারে লাফিয়ে পড়লাম।

এমন বোকার মত কাণ্ড কর তুমি! আরক্ত মুখে, বিরক্তির আবরণে মনের কিংকর্তব্য ভাবকে আড়াল করবার চেষ্টায় অনুযোগের স্বরে তিনি বললেন, সত্যি, চোট লাগতে পারত তো? আচ্ছা বেশ, এবার কেমন করে বেরোবে?

এই অস্বস্তির ভাব ক্রমেই তাঁর বেড়ে চলল, কিন্তু তাঁর এই অবস্থা দেখে যত আমোদ না পেলাম, তার চেয়ে ভয় পেলাম বেশী। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ক্রমে আমার ওপরেও সংক্রামিত হল, অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। ওঁর দিকে তাকাতে পারলাম না, কী যে বলব ঠিক করতে না পেরে অন্যমনে শুধু চেরি তুলেই চলেছি—অথচ চেরিগুলোকে কোথায় রাখব তা জানিনা। ধিক্কার দিলাম নিজেকে, কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা হল। ভয় হল, এই বোকামির জন্য হয়ত চিরদিনের জন্যই তাঁর ধারণায় আমি খাটো হয়ে গেলাম। দুজনেই চুপচাপ, এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া দুজনকেই আশ্রয় করেছে। এই কঠিন অবস্থা থেকে আমাদের উদ্ধার করল সোনিয়া, চাবি নিয়ে দৌড়ে এল সে। সোনিয়ার সঙ্গেই কিছুক্ষণ আমাদের কথাবার্তা চলল, নিজেদের কথা চাপা পড়ল। কাতিয়ার কাছে আসতে সে বলল সে জেগেই ছিল এবং আমাদের সব কথাই শুনেছে। ততক্ষণে আমরা সামলে নিয়েছি, আমাদের সহজ অবস্থা ফিরে এসেছে। তিনিও আবার সেই পিতৃব্যসুলভ গুরু-গম্ভীর সুর ধরেছেন। কিন্তু আমি তাতে ভুললাম না; কয়েকদিন আগে আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল আমার তা স্পষ্ট মনে পড়ল।

কাতিয়া বলেছিল, প্রেমে পড়া অথবা প্রেম নিবেদন করা

নারীর চেয়ে পুরুষের পক্ষে অনেক বেশী সহজ। বলেছিল, পুরুষ বলতে পারে সে প্রেমে পড়েছে, কিন্তু নারী তা পারে না। উত্তরে উনি বলেছিলেন, আমি একথা অস্বীকার করি। প্রেমে পড়েছি,—একথা বলার অধিকার পুরুষের ও নেই, সে একথা বলতেই পারে না।

কেন পারেনা? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

কারণ এ কখনো সত্যি হতে পারে না। প্রেমে পড়েছে, এ আবার কেমনধারা খবর? পুরুষ হয়ত মনে করে, কথাটা উচ্চারণ করা মাত্র একটা কিছু ঘটে যাবে, কামানের নির্ঘোষের সঙ্গে হয়ত অলৌকিক কিছু প্রকাশ পাবে। আমার মতে, যে পুরুষ খুব গম্ভীর গলায় প্রেম নিবেদন করে, হয় সে নিজেকে প্রতারণা করে, কিংবা যা তার চেয়েও খারাপ, অপর পক্ষকে প্রতারণা করে।

কিন্তু নারী তাহলে কী করে জানবে যে পুরুষ তাকে ভালবাসে, পুরুষ যদি তাকে না বলে? কাতিয়া জিজ্ঞাসা করেছিল।

তা জানিনা। তবে প্রত্যেকেরই মনোভাব প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গী আছে। মনে যদি তেমন ভাবের উদয় হয় তো প্রকাশ পাবেই যেমন করে হোক। যখনি কোন উপন্যাস পড়তে বসি, আমার কল্পনায় ফুটে ওঠে লেঃ স্ট্রেলস্কি বা এ্যালফ্রেডের জ্যোতিহীন দৃষ্টি যখন সে বলে, আমি তোমাকে ভালবাসি, ইলেনোরা,—আর আশা করে যে সঙ্গেসঙ্গেই আশ্চর্য কিছু পরিবর্তন দেখা যাবে, অথচ দুজনের কারো মধ্যেই কিছুমাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হয় না।

সেই সময়েও আমার ধারণা হয়েছিল যে এই বচসার মধ্যে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সুর আছে যা বিশেষ করে আমার ওপরে প্রযোজ্য। কাতিয়া কিন্তু উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সম্বন্ধে এই

অসম্মানকর উক্তির প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বলেছিল, আপনি কোনসময়েই সীরিয়স নন। আচ্ছা বলুন তো সত্যি করে, কখনো কি কোন নারীকে আপনি প্রেম নিবেদন করেন নি ?

উনি হেসে বলেছিলেন, কখনো না। জীবনে কখনো কারো কাছে আমি জানু পেতে বসিনি, এবং কখনো বসবও না।

এই কথোপকথনের দৃশ্য আমার মনে পড়ে গেল ; ভেবে দেখলাম, তিনি যে আমাকে ভালবাসেন একথা মুখ ফুটে বলবার কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি যে আমাকে ভালবাসেন, এ তো আমি ভাল করেই জানি, যতই নির্লিপ্ত ভাব তিনি বজায় রাখতে চেষ্টা করুন না কেন, এ বিশ্বাস আমার অটল থাকবে।

সারা সন্ধ্যা তিনি আমার সঙ্গে খুব কম কথাই কইলেন ; কিন্তু কাতিয়া আর সোনিয়ার সঙ্গে তাঁর যেক'টি কথা হল তার ভেতর দিযে, তাঁর প্রতিটি দৃষ্টিপাতে, চলাফেরার প্রতি ভঙ্গিতে তাঁর ভালবাসা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাচ্ছিল। আমার কিন্তু এতে বিরক্ত লাগল, ওঁর জন্য দুঃখ হল এই ভেবে যে এখনো উনি প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখা প্রয়োজন মনে করছেন, যখন সব সন্দেহের নিরসন হয়েছে, অসীম সুখের পথ সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে, কুঞ্জের মধ্যে ওভাবে ওঁকে চমকে দেওয়ার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হল।

চায়ের পর আমি পিয়ানোর কাছে গেলাম, তিনিও পিছু পিছু এলেন।

বৈঠকখানা বরাবর এসে তিনি আমাকে ধরে ফেললেন, বললেন, একটা কিছু বাজাও, অনেকদিন তোমার বাজনা শুনিনি।

হ্যাঁ, বাজাতেই তো যাচ্ছি। বলে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, সার্জি মিখায়েলিচ, আমার ওপর রাগ করেন নি তো ?

কিসের জন্য ?

আজ বিকেলে আপনার কথা শুনিনি বলে ? বলতে বলতে আমার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

উনি আমার কথা বুঝলেন। মাথা নেড়ে এমন ভাব দেখালেন যার মানে হল, আমাকে ধমক দেওয়াই উচিত, কিন্তু ধমকাতে তাঁর মন সরছে না।

তাহলে সব মিটে গেল তো, আবার আমরা বন্ধু ? পিয়ানোয় বসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ, নিশ্চয় !

প্রকাণ্ড বসবার ঘরটায় শুধু পিয়ানোর ওপরে দুটো মোমবাতি জ্বলছে, বাকি ঘরটা আধো-অন্ধকার। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। গ্রীষ্মের রাত আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিক স্তব্ধ, মাঝেমাঝে কেবল অন্ধকার বৈঠকখানা ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে কাতিয়ার নড়া-চড়ার আওয়াজ, আর জানলার নিচে যেখানে তাঁর ঘোড়াটা বাঁধা ছিল সেখান থেকে কানে আসছে ঘোড়াটার ফোঁস ফোঁস শব্দ,—আশেপাশের আগাছাগুলোর মধ্যে তার পা ছোঁড়ার শব্দও মাঝেমাঝে কানে আসছে। আমার পেছনে যেখানে তিনি বসে আছেন, আমার দৃষ্টি সেখানে যায় না ; কিন্তু সর্বত্রই—সেই আধো-অন্ধকার ঘরে, প্রতিটি শব্দের মধ্যে, এমন কি আমার অন্তরের অন্তস্থলে পর্যন্ত আমি তাঁর উপস্থিতি অনুভব করছি। অদৃশ্য থেকেও তাঁর প্রতিটি দৃষ্টিপাত, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছে। আমি মোজার্টের একটা সোনাটা ধরলাম—এটা

তিনিই আমাকে এনে দিয়েছিলেন এবং তাঁরই উপস্থিতিতে আমি এটা শিখি। কী বাজাচ্ছি সেদিকে আমার খেয়াল নেই,—তবে আমার বিশ্বাস আমি ভালই বাজাচ্ছি আর মনে হয়, তাঁরও ভাল লাগছে। তাঁর যে ভাল লাগছে এ আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছি, এও বুঝতে পারছি একবারও তাঁর দিকে না তাকিয়ে যে, তিনি পেছন থেকে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। যন্ত্রচালিতের মত আঙুল চালাতে চালাতে হঠাৎ সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছু ফিরে ওঁর দিকে তাকালাম। বাইরে রাত্রি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ঘরের অন্ধ আবছায়ার মধ্যে তাঁর মাথাটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। মাথাটা দুহাতের মধ্যে রেখে তিনি বসে রয়েছেন, আমার দিকে তাকাতে তাঁর চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টির মিলন হতেই আমি বাজনা বন্ধ করলাম। তিনিও হাসলেন, বাজনা থামাবার জন্য ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার আমাকে বাজাতে ইসারা করলেন। বাজনা যখন শেষ হল, চাঁদ ততক্ষণে আরো উজ্জ্বল হয়ে মধ্যাকাশে পৌঁছেছে। রুপোলি আলো জানলা দিয়ে এসে মেঝেয় পড়ে মোমবাতির স্তিমিত আলোর সঙ্গে মিশেছে। কাতিয়া বলে উঠল, এ সত্যি খুব অন্যায়। একে তো আমি নাকি ভাল বাজাচ্ছিলাম না, তার ওপর আবার সবচেয়ে ভাল জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে পড়েছি, তাই কাতিয়ার এই অভিযোগ। তিনি কিন্তু বললেন যে এমন চমৎকার নাকি আমি আগে কখনো বাজাইনি। বলে ঘরগুলোর মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন। বসবার ঘর থেকে বৈঠকখানা ঘরে গেলেন, আবার সেখান থেকে বসবার ঘরে ফিরে এলেন। এই যাওয়া আসার পথে প্রতিবার আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমিও মৃদু হাসলাম, ইচ্ছা হল শুধু অকারণ

পুলকেই হো হো করে হেসে উঠি। সেদিনের একটা ব্যাপারে আমার মন ফুর্তিতে ভরপুর ছিল। কাতিয়া আর আমি পিয়ানোর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যতবার তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন ততবারই আমি কাতিয়াকে চুমু খেয়েছি—তার চিবুকের নিচের নরম জায়গাটায় যেখানে আমি চুমু খেতে ভালবাসতাম। আর যখনি তিনি ফিরে এসেছেন, খুব গম্ভীর মুখ করে, অতি কষ্টে হাসি চেপেছি।

কী হল ওর বলুন তো? কাতিয়া ওঁকে জিজ্ঞাসা করল।

আমার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলেন তিনি, কোন উত্তর করলেন না। কী যে আমার হয়েছে, তিনি তা ভাল করেই জানেন।

কী অদ্ভুত রাত্রি দেখ! বৈঠকখানা ঘরের জানলার কাছে যেখানে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সেখান থেকে আমাকে ডেকে তিনি বললেন।

আমরা তাঁর কাছে গেলাম। সত্যি, তেমন রাত্রি পরে আর কখনো দেখিনি। বাড়ির ওপরে, পেছন দিকটায় যেখান পূর্ণিমা চাঁদ শোভা পাচ্ছে, সেখানে আমাদের দৃষ্টি যায় না। বাড়ির ছাদ, থাম আর বারান্দার ছায়ার অর্ধেকটা তীর্যকভাবে এসে সুরকি-বিছোনো পথ আর তার ওপারের টুকরো ঘাসজমির ওপরে খাটো হয়ে পড়েছে। এছাড়া সমস্ত কিছুই রূপোলি শিশির আর চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। ডালিয়া আর তার মাচার শীতল ছায়া সুরকি-ছাওয়া অসমান পথের এক অংশে ঝলমল করে উঠেছে, সে পথ সিধে চলে গিয়েছে যতক্ষণ না নিজেকে কুয়াসার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে সবজি-ঘরের আলো-মাখানো ছাদ চোখে পড়ছে। এক ক্রমবর্ধমান কুয়াসা খাদ থেকে উঠে আসছে ক্রমশ।

পত্রবিরল লিলাক-কুঞ্জের ভেতর পর্যন্ত আলোয় আলোময়। প্রতিটি ফুল আলাদা করে চেনা যাচ্ছে, একেবারে শিশিরে চোবানো। আলো আর ছায়া এমন ওতপ্রোতভাবে পথের ওপরে মিশে রয়েছে যে তাকে আর পথ বা গাছ মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে কয়েকটা স্বচ্ছ বাড়ি যেন, নড়ছে, দুলে দুলে উঠছে। আমাদের ডাইনে, যেখানে বাড়ির ছায়া পড়েছে, সব একাকার, কালোয় কালো। চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে একটা পপলার গাছের চূড়ো পাতার অদ্ভুত মুকুট পরে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে; কোন্ আশ্চর্য কারণে জানিনা দূরে অপস্রিয়মান ঘন নীল আকাশের প্রায়ান্ধকারে মিলিয়ে না গিয়ে তারা ঝলমলে আলোয় মাথ তুলে রয়েছে।

আমি বললাম, চল বেড়াতে যাই।

কাতিয়া রাজি হল বটে, কিন্তু বলল, তাহলে আমাকে গালোশ পরতে হবে।

তার দরকার নেই কাতিয়া, আমি সাজি মিখায়েলিচের হাত ধরেই যাব।

যেন এ হলেই আর আমার জুতো ভিজে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। অথচ ব্যবস্থাটা তখন আমাদের তিনজনের কাছেই বেশ স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তিনি হাত না বাড়ালেও আমি নিজেই তাঁর হাত ধরলাম, আর এ ব্যাপারটাও তাঁর কাছে একটুও অস্বাভাবিক মনে হল না। সবাই একসঙ্গে বারান্দা থেকে নামলাম। সমস্ত পৃথিবী, আকাশ বাতাস, এমনকি আমাদের এই বারান্দা পর্যন্ত যেন আজ নতুন হয়ে আমার কাছে দেখা দিচ্ছে।

দুধারে গাছের সারি দেওয়া পথ দিয়ে আমরা চলেছি। সামনের

দিকে তাকাতে মনে হচ্ছে, আর বুঝি সেদিকে এগোনো সম্ভব নয়, বাস্তব জগতের এই বুঝি শেষ। মনে হচ্ছে, সৌন্দর্যের এই অপূর্ব সত্তার আমার সামনে চিরন্তন হয়ে থাকবে। কিন্তু তবুও আমরা এগিয়ে চললাম। যত এগোই, সামনের ম্যাজিকের দেয়ালটা আমাদের পথ করে দিতে দিতে ততই পেছিয়ে যায়। অথচ তখনো সেই পরিচিত বাগান, তার গাছ তার শুকনো পাতার রাশি আর পথের সারি নিয়ে আমাদের ঘিরে রয়েছে। এই যে বাগানের আলোছায়ায় মাথা পথ বেয়ে আমরা চলেছি এ তো অলীক নয়, ঐ যে একটা শুকনো পাতা আমার পায়ের তলায় মর্মর শব্দ তুলল, একটা কচি লতা আমার মুখে ঘসে গেল, এও তো বাস্তব। এই যে ইনি ধীর পদক্ষেপে সন্তর্পণে আমার হাত ধরে চলেছেন, আর ঐ যে কাতিয়া মচমচে জুতো পরে আমাদের পাশেপাশে চলেছে, এ সমস্তই তো সত্য। আর ঐ যে আকাশ থেকে স্তব্ধ ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের ওপর কিরণ-সম্পাত করছে, ওও তো চাঁদ ছাড়া আর কিছু নয়!

কিন্তু প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যেন ম্যাজিকের দেয়ালটা আমাদের সামনে পেছনে দুদিক থেকেই ঘিরে ফেলছে; মনে হচ্ছে, এগিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হবে না। সমস্ত ব্যাপারটাই যে বাস্তব, এ যেন আর আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না।

ঐ একটা ব্যাঙ! কাতিয়া চেঁচিয়ে উঠল।

কে কথা কইল, কেন কইল? তখন মনে হল, এ কাতিয়া, ব্যাঙ দেখে ভয় পায়। মাটির দিকে তাকাতে চোখে পড়ল একটা ছোট ব্যাঙ, লাফিয়ে উঠে আমার সামনে চুপ করে বসে রয়েছে, ছোট্ট ছায়াটা পথের চকচকে মাটির ওপরে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

তুমি কি ব্যাঙ দেখে ভয় পাও? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

তাঁর দিকে তাকালাম। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানে পথের একদিকে একটা গাছ কম ছিল, তাঁর মুখটা সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কী সুন্দর সে মুখ, কী অপার তৃপ্তি সেখানে ফুটে রয়েছে!

মুখে অবশ্য তিনি ব্যাঙের ভয়ের কথা বললেন, কিন্তু আমি জানি তিনি বলতে চাইছেন, তোমায় আমি কত ভালবাসি! 'ভালবাসি' কথাটা তাঁর দৃষ্টি, তাঁর বাহু যেন নতুন করে আমাকে শোনাল। এই আলো, এই ছায়া, এই বাতাস পর্যন্ত যেন ঐ কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

সমস্ত বাগানটা আমাদের ঘোরা হল। ছোট ছোট পা ফেলে কাতিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছিল, কিন্তু এবার সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বলল, এবার ফেরার সময় হয়েছে। কাতিয়ার জন্য আমার দুঃখ হল। আহা বেচারা, আমি ভাবলাম, ওরও কেন আমাদের মত অনুভূতি হচ্ছে না? এই রাত্রির মত, ওঁর মত, আমার মত সবাই কেন যৌবনসম্পন্ন নয়, সুখী নয়?

আমরা ফিরলাম, কিন্তু তাঁর যেতে তখনো অনেক দেরি। মুরগির ডাক শুরু হল, বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘোড়াটা জানলার কাছ থেকে ক্রমাগত শব্দ করতে লাগল, একটা গাছে পা ঠুকতে লাগল। কাতিয়া আমাদের সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয় নি; ফলে সময়ের চিন্তা না করে আমরা গল্প করে চললাম। অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সে গল্প। এইভাবে চলল রাত দুটো পর্যন্ত। মুরগিটা এবার নিয়ে তিনবার ডেকে উঠল, ভোর হয়ে এসেছে দেখে তিনি বিদায় নিলেন। যাবার আগে শুধু গতানুগতিক ভাবে বিদায় নিলেন, এসব ব্যাপারের কোনো বিশেষ উল্লেখ

করলেন না। কিন্তু সেদিন থেকে আমি নিঃসন্দেহে জানলাম যে তিনি আমারই, তাঁকে আমি কোনদিন হারাব না। তাঁকে ভালবাসি একথা নিজের মনের কাছে স্বীকার করবার পরই আমি কাতিয়াকে সব খুলে বললাম। কাতিয়া উল্লসিত হল, কথাটা গোপন না রেখে ওকে যে খুলে বলেছি তাতে ও কৃতজ্ঞ হল। কিন্তু তবুও সে শুতে গেল, ঘুমোতে পারল। বেচারা! আর আমি! অনেকক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করবার পর বাগানে নেমে গেলাম। তাঁর প্রতিটি কথা, চলাফেরার প্রত্যেক ভঙ্গি চিন্তা করতে করতে যে পথে তাঁর সঙ্গে বেড়িয়েছিলাম আবার সেই পথ ধরলাম। সে রাত্রে আমি একটুও ঘুমোইনি, জীবনে সেই প্রথম দেখলাম সূর্যোদয়, প্রথম প্রত্যুষ। অমন রাত্রি, অমন প্রভাত, পরে আর কখনো আমার জীবনে আসেনি। ভাবলাম, তিনি যে আমাকে ভালবাসেন, একথা স্পষ্ট করে বলেন না কেন? কেন মিথ্যে বাধার কল্পনা করেন, নিজেকে বুড়ো বলেন, সমস্তই যখন এত সহজ, এত সুন্দর? এই তো সোনালি সুযোগ, এমন সুযোগ পরে হয়ত আর আসবে না। কেন তিনি এ হেলায় হারাচ্ছেন, বলছেন না কেন, আমি তোমায় ভালবাসি? বললেই তো পারেন সহজভাবে? আমার হাতে হাত রেখে কেন মুখ ফুটে বলেন না, তোমায় ভালবাসি? লজ্জায় রাঙা হয়ে নত মুখে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেই তো পারেন, তা হলেই তো আমি ওঁকে মনের কথা খুলে বলতে পারি! না, বলা নয়, দুহাতে চেপে জড়িয়ে ধরি আর শুধু কাঁদি! হঠাৎ মনে হল, কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আমারই ভুল হয়েছে, সত্যি তিনি আমাকে ভালবাসেন না?

একটা ছবির দিকে তাকিয়ে রয়েছে—দন্তহীন মাড়ি দিয়ে কি অস্পষ্ট শব্দ করছে। এ সমস্তকে শুধু পুরোনো দিনের স্মৃতি হিসেবেই কৌতুকোদ্দীপক মনে হল না,—পরম পবিত্র ও প্রভূত অর্থপূর্ণ বলেই মনে হল। প্রার্থনার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনলাম, আমার মনোভাবের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যসাধনের চেষ্টা করলাম। যেখানে যেখানে ঠিক বোধগম্য হল না হয় নীরবে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বর যেন আমাকে বোধশক্তি দেন, কিংবা এই প্রার্থনার পরিবর্তে মনগড়া কোনো প্রার্থনা তৈরি করে আবৃত্তি করলাম।

অনুতাপের প্রার্থনার পুনরাবৃত্তির সময় আমি আমার অতীত জীবনের কথা মনে করলাম। অতীতের ছেলেমানুষিভরা নির্দোষ দিনগুলোকে আমার হৃদয়ের বর্তমান অবস্থার তুলনায় এত কলুষিত মনে হল যে আমি কেঁদে ফেললাম, আতঙ্কিত হলাম নিজের কথা ভেবে। অবশ্য এ-কথাও আমার মনে হল যে আমার এ সমস্ত পাপেরই ক্ষমা আছে,—পাপ যদি আরো অধিক হত, সেক্ষেত্রে আমার অনুতাপও হত অনেক বেশি মধুর। উপাসনার শেষে পুরোহিত যখন বললেন—ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার ওপর নেমে আসুক, সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র অনুভূতিতে আমার হৃদয় ভরে উঠল। উপাসনা শেষ হতে পুরোহিত আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন প্রার্থনার জন্য তিনি আমাদের বাড়িতে আসবেন কি না এবং কখন এলে আমার সুবিধে হবে। আমি ওঁকে ধন্যবাদ জানালাম, বুঝলাম আমার তুষ্টির জন্যই ওঁর এ প্রশ্ন। উত্তরে বললাম, আমিই গীর্জায় যাবখন, গাড়ি করে বা পায়ে হেঁটে যেমন করে হোক।

তিনিই বলে উঠলেন, কিন্তু সে তো বড় কষ্টকর হবে! কী যে

উত্তর দেব ভেবে পাই না, ভয় হয় পাছে অহঙ্কারের পরিচয় দিয়ে আবার অপরাধ করে বসি।

প্রার্থনার পর যখন কাতিয়া সঙ্গে না থাকত আমি গাড়ি ফিরিয়ে দিতাম। হেঁটে ফেরার পথ ধরতাম, যাকে দেখতাম তাকেই নত হয়ে অভিবাদন জানাতাম, সুযোগ খুঁজতাম কখন্ কাকে কোনো উপদেশ দেওয়া যায়, কোনরকমে সাহায্য করা যায়। কারো জন্য আত্মবিসর্জন দেওয়া, কোনো গাড়ি পড়ে গেলে তুলতে সাহায্য করা, কোনো ছেলের দোলায় দোল দেওয়া, পথ ছেড়ে কাদায় দাঁড়িয়ে অপরকে রাস্তা করে দেওয়া—এসবেই ব্যস্ত হয়ে উঠতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা শুনলাম পেয়াদা কাতিয়াকে বলছে আমাদের ভৃত্য সাইমন তার মেয়ের কফিন তৈরি করবার জন্য কিছু কাঠ, আর অন্ত্যেষ্টির জন্য পুরোহিতকে দেবে বলে কিছু ভিক্ষে করেছে এবং পেয়াদা তার অনুরোধ রেখেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এতই গরিব কি ওরা? পেয়াদা বলল, সত্যিই ওরা খুব গরিব, মা,—নুন পর্যন্ত ওদের জোটে না। ওর কথায় আমার প্রাণ ব্যথিয়ে উঠল, কিন্তু কেমন একধরণের অদ্ভুত আনন্দও এতে পেলাম। একটু বেড়াতে যাচ্ছি কাতিয়াকে এই বলে আমি তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে যা কিছু পয়সাকড়ি ছিল (খুব সামান্যই অবশ্য) সমস্ত নিলাম। তারপর ঈশ্বরকে স্মরণ করে সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা পেরিয়ে, বাগানের ভেতর দিয়ে, সাইমনের কুটির লক্ষ্য করে একা বেরিয়ে পড়লাম। সাইমনের বাড়ি ছিল গ্রামের অপর প্রান্তে। সবার অলক্ষ্যে জানলার কাছে গিয়ে পয়সাগুলো রেখে কাঁচে শব্দ করলাম। কে একজন বেরিয়ে আসছে, দরজাটা ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল।

আমাকে উদ্দেশ্য করে ডাকল সে। কিন্তু ততক্ষণে আমি বাড়ির পথ ধরেছি; শীত করছে, অপরাধীর মত কেঁপে উঠছি ভয়ে। কাতিয়া জিজ্ঞাসা করল আমি কোথায় গিয়েছিলাম, আমার কী হয়েছিল, কিন্তু আমি নিরুত্তর রইলাম। বুঝতে পারলাম না পর্যন্ত ও কী বলছে, হঠাৎ যেন সমস্ত কিছুই আমার কাছে অত্যন্ত সামান্য, পরম অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠল। ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম। কোনো কাজে মন বসছে না, চিন্তা করতে পারছি না, নিজের মনোভাব পর্যন্ত বুঝতে পারছি না ঠিকমত। মনে হল, ওদের সংসারটা কেমন আনন্দমুখর হয়ে উঠবে, হিতৈষীর কত সুখ্যাতিই না ওরা করবে! দুঃখ হল এই ভেবে, টাকাটা আমি নিজের হাতে দিলাম না কেন! সাজি মিখায়েলিচ যদি জানতে পারতেন তাহলে কী মনে করতেন তাই আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম। কেউ জানতে পারবে না এ কার কাজ, একথা মনে হতে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। আনন্দের আতিশয্যে অন্য সকলকেই নিজের তুলনায় নিকৃষ্ট মনে হল; নিজের সম্বন্ধে, সমস্ত জগৎ সম্বন্ধে আমার এমন মনোভাবের সৃষ্টি হল যে মৃত্যুর চিন্তা পর্যন্ত আমার কাছে এক সুখের স্বপ্নের মতই মনে হল। আমি হাসলাম, প্রার্থনা করলাম, কাঁদলাম; সমস্ত জগতের জন্য আমার মনে প্রীতির তীব্র শিখা জ্বলে উঠল। প্রার্থনার সময় ছাড়া অন্য সময় আমি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতাম। যত পড়ি ততই তা আমার কাছে সুবোধ্য হয়ে ওঠে, দিব্য জীবনের কাহিনী ক্রমেই সরল হয়ে অন্তর স্পর্শ করে। যত পড়ি, চিন্তা ও অনুভূতির প্রখরতা ততই অতলস্পর্শী হয়ে ওঠে। বই বন্ধ রেখে যখন চারিদিকে তাকিয়ে চিন্তা করি, সমস্তই কেমন সহজ, সুসম হয়ে দেখা দেয়। মনে

হয়, অন্যায় করা কত কঠিন, আর সবাইকে ভালবাসা, সবার ভালবাসা লাভ করা কত সহজ! সকলের কাছেই কত সহৃদয় ব্যবহার পাই! সোনিয়াকে পড়ানো তখনো আমি বন্ধ করিনি, সে পর্যন্ত কত বদলে গেছে ; পড়া বুঝতে চেষ্টা করে, আমাকে বিরক্ত করা তো দূরের কথা, বরং চেষ্টা করে আমি যাতে খুসি হই। আমি যেমন ব্যবহার সকলের সঙ্গে করছি, তেমনি ব্যবহার পাচ্ছিও সকলের কাছ থেকে। আমার যারা শত্রু, ঠিক করলাম অপরাধ স্বীকার করবার আগে তাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করব। তাদের কথা চিন্তা করতে কেবল একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল। মেয়েটি আমাদের প্রতিবেশী। বছর খানেক আগে একটা বিষয়ে আমি তাকে ঠাট্টা করেছিলাম, সেই থেকে সে আমাদের বাড়িতে আসে না। অপরাধ স্বীকার করে চিঠিতে ক্ষমা চেয়ে পাঠাতে উত্তরে সে লিখল, সে আমাকে ক্ষমা করেছে, এখন আমি যেন তাকে ক্ষমা করি। অত্যন্ত সাদাসিধে এ চিঠি, অথচ এতেই আনন্দের আতিশয্যে আমার চোখে জল এল, এক গভীর অনুভূতির সন্ধান ওর মধ্যে পেলাম। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, সবাই আমার ওপর এমন সদয় কেন? কা আমি করেছি যাতে সবাই আমাকে এত ভালবাসে? সার্জি মিখায়েলিচের কথা প্রায়ই মনে হত, তাঁর চিন্তায় অনেকটা সময় কেটে যেত, কিছুতেই সে চিন্তা মন থেকে সরাতে পারতাম না এবং এ চিন্তাকে পাপচিন্তা বলেও কখনো মনে হত না। প্রথম যেদিন জানলাম তাঁকে ভালবাসি সেদিন তাঁকে যেভাবে চিন্তা করেছি, আজকের চিন্তাধারা তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আজ যেন তিনি আমারই দ্বিতীয় সত্তা হয়ে পড়েছেন, আমার প্রত্যেক ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর সান্নিধ্যে এলে আগে নিজেকে হীন মনে হত,

কিন্তু সে ভাব এখন একেবারে কাটিয়ে উঠেছি। নিজেকে তাঁর সমান বলেই মনে হচ্ছে; মানসিক উৎকর্ষতার যে স্তরে এসে পৌঁছেছি সেখান থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি। তাঁর যে ব্যবহার আমার অদ্ভুত লাগত, তার অর্থ বুঝতে এখন অসুবিধা হয় না। এখন বুঝি কেন তিনি বলতেন পরের উপকারে জীবন পাত করাতেই প্রকৃত সুখ, এবং আজ আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। স্থির ধারণা হল, ওঁর সঙ্গে মিলিত হলে নিরবচ্ছিন্ন সুখে আমাদের দিন কাটবে। বিদেশ ভ্রমণ, ফ্যাসন-দুরস্ত সমাজ বা সাজপোষাকের আড়ম্বর, এসবে আমার মন উঠল না,—এর বদলে এক নূতন ধরণের স্বপ্ন আমার মন ছেয়ে ফেলল। শান্ত গ্রাম্য জীবন, পরোপকারে আত্মসমপণ, অবিচ্ছিন্ন ভালবাসা, সমস্ত বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের করুণার সন্ধান পাওয়া, এই সব নিয়েই গড়ে উঠেছিল আমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

জন্মদিনের দিন দীক্ষা নেবার যে সঙ্কল্প করেছিলাম তা কার্যে পরিণত হল। সেদিন গীর্জা থেকে ফিরে আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে ছিল, উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে আমার জীবনের আশঙ্কা পর্যন্ত হল, এমন কোনো অনুভূতিও পোষণ করতে সাহস হল না যা এই সুখের পরিপন্থী হতে পারে। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতে যাব, এমন সময় দেখি, সার্জি মিখায়েলিচও তাঁর সেই গাড়িতে করে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আমাকে অভিনন্দন * জানালেন, তারপর আমরা একসঙ্গে বাইরের ঘরে গেলাম। এতদিন তাঁর সঙ্গে মিশছি, তবু এর আগে কখনো তাঁর কাছে সেদিনের মত এতটা সহজ হতে

---

* রাশিয়ার একটা সামাজিক রীতি হল, কারো জন্মদিনে বা দীক্ষা গ্রহণের দিনে তাকে অভিনন্দন জানানো।

পারিনি। নিজের মধ্যেই যে সম্পূর্ণ জীবনের সন্ধান আমি পেয়েছি, তা তাঁর আয়ত্তের অতীত। পরম নিঃসঙ্কোচে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি। আমার এ অনুভূতির কারণ হয়ত তিনি আন্দাজ করেছিলেন, কারণ সেদিন যেন তাঁকে অন্যদিনের চেয়ে বেশী স্নেহশীল, আরো কোমলহৃদয় মনে হল, আমার প্রতি এক সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয়ও তাঁর কাছে পেলাম। পিয়ানোর কাছে যাব, কিন্তু তিনি পিয়ানোটা বন্ধ করে চাবি পকেটে পুরলেন, বললেন, তোমার মনের বর্তমান ঐশ্বর্য এভাবে নষ্ট কোরো না, জগতের সমস্ত সঙ্গীতের সবচেয়ে মধুর যে সঙ্গীত, তাই আপাতত তোমার প্রাণে বাজছে।

ওঁর কথায় আমি কৃতজ্ঞ হলাম, কিন্তু এত সহজে, এমন পরিষ্কার ভাবে আমার গূঢ় রহস্য তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হওয়া আমার খুব পছন্দ হয়নি। খাবার টেবলে বসে তিনি বললেন, কেবল যে আমাকে অভিনন্দন জানাতে তিনি এসেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে বিদায় নিতেও এসেছেন, কারণ পরদিনই তিনি চলে যাচ্ছেন। কথা কইতে কইতে তিনি কাতিয়ার দিকে তাকালেন, কিন্তু তারপর একবার যেভাবে চোরাদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন তা থেকে বুঝলাম যে ওঁর ভয় হয়েছিল পাছে আমার মুখে উচ্ছ্বাসের কোনো আভাস লক্ষিত হয়। আমি কিন্তু এতে বিস্ময় বা উদ্বেগ কিছুই বোধ করিনি; তাঁর ফিরতে দেরি হবে কিনা, একথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলাম না। তিনি যে একথা বলবেন এ আমি জানতাম। এও জানতাম যে আসলে তিনি যাবেন না। কী করে জানলাম? তা এখন আমি নিজেকেও বোঝাতে পারব না, কিন্তু সেই পরম মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, যেন যা কিছু ঘটেছে আর যা কিছু ঘটবে কিছুই আমার জানতে বাকি নেই। এ এক

সুখের স্বপ্ন যেন; যা কিছু এখন ঘটছে সব যেন একান্ত পরিচিত, অনেক আগে থেকেই ঘটে আসছে; এবং আবার যে ঘটবে, তাও কারো অজানা নয়। তিনি ঠিক করেছিলেন খাওয়া সেরেই তক্ষুনি বেরিয়ে পড়বেন; কিন্তু কাতিয়া গীর্জা থেকে এসে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে তার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য তাঁকে দেরি করতে হল। সূর্যের আলো বসবার ঘরে এসে পড়েছে। আমরা বারান্দায় গিয়ে বসলাম, ধীরে আবার সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করলাম, যার ওপর নির্ভর করছে আমার সমগ্র ভবিষ্যৎ। বসবার সঙ্গে-সঙ্গেই কথাটা পড়লাম, পাছে অন্য কথা উঠে আসল বিষয়বস্তুকে চাপা দিয়ে দেয়। এই যে ধীরে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে অবাস্তব কথা বাদ দিয়ে নিখুঁত ভাবে কথা কইছি, এ যে আমার কোথা থেকে এল আমি নিজেই তা বলতে পারব না। আমার ইচ্ছার বাইরে থেকেই কে যেন আমার মুখ দিয়ে কথা কইছে। বারান্দার রেলিঙে কনুই রেখে তিনি আমার মুখোমুখি বসেছেন, একটা লিলাকের ডাল টেনে তার পাতাগুলো ছিঁড়ছেন। আমি কথা শুরু করতে তিনি ডালটা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে মাথা ভর করে রইলেন। তাঁর এ ভঙ্গিব অর্থ মোটেই সুস্পষ্ট নয়, পূর্ণ প্রশান্তি অথবা গভীর হৃদয়াবেগ, দুয়েরই পরিচয় এ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

কেন যাচ্ছ তুমি? সোজা তাঁর দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

কথার উত্তর তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিলেন না, চোখ নামিয়ে, মিনমিন করে বললেন, কাজ।

আমার স্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে আমার কাছে এ ভাবে মিথ্যা বলতে তাঁর

যে অত্যন্ত কষ্ট হল, সে আমার বুঝতে বাকি রইল না। আমি বললাম, শোন। তুমি তো জান, আজকের দিনটা অনেক দিক দিয়েই আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি যখন এ প্রশ্ন করছি তখন তোমার কাজের প্রতি যে উৎসাহ দেখাচ্ছি তা নয়, (জান তো, আমি তোমার কত ঘনিষ্ঠ, কত অনুরক্ত হয়েছি!) এ কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি, এর সঠিক উত্তর আমি চাই। বল, কেন যাচ্ছ তুমি?

তিনি বললেন, সঠিক কারণ তোমাকে বলা কত কঠিন! সারা সপ্তাহটা ধরে আমি তোমার আর আমার কথা অনেক ভেবেছি, শেষপর্যন্ত ঠিক করেছি যে আমাকে যেতেই হবে। তুমি তো বুঝছ কেন; তুমি যদি আমাকে ভালবাস তো এ বিষয়ে কোনো কথা তুলো না। এই বলে তিনি হাতটা কপালে বুলিয়ে নিলেন, তারপর চোখ ঢেকে বললেন, এতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে···কিন্তু তুমি তো বুঝবে!

আমার হৃদস্পন্দনের গতি দ্রুততর হল। বললাম, বুঝতে পারছি না তোমায়,—কিছুতেই পারছি না। বল তুমি,—ঈশ্বরের দোহাই, অন্ততঃ আজকের দিনের খাতিরে তুমি আমায় বল যা তোমার বলবার। আমি শান্ত হয়ে শুনব।

একটু সরে বসলেন তিনি, আমার দিকে তাকালেন। লিলাকের ডালটা আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন একটু।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে, কণ্ঠস্বর শান্ত করবার বিফল প্রয়াসের পর তিনি বললেন, দেখ, অতি সামান্য ব্যাপার, কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যাই হোক তবু বোঝাবার চেষ্টা করব। বলে তিনি এমন ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন যেন মনে হল তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে।

বল।

এমন একজন পুরুষের কথা মনে কর—ধর তার নাম ক। যৌবনকে সে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। আর এক নারী—যাকে আমরা বলব, খ। অল্পবয়স্ক মেয়েটি, জীবনের বা সংসারের কোনো অভিজ্ঞতাই তার হয়নি। ঘটনাচক্রে দু'জনের ঘনিষ্ঠতা হল, পুরুষটি তাকে মেয়ের মত ভালবাসতে শুরু করল। এ আশঙ্কা তার কখনো হয়নি যে তার এই ভালবাসার কখনো রূপান্তর ঘটবে।

এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন, কিন্তু আমি বাধা দিলাম না।

কিন্তু সে ভেবে দেখেনি যে খ-র বয়স অল্প, জীবন অবিচ্ছিন্ন সুখের বলেই আর ধারণা। বলতে বলতে তাঁর দ্বিধার ভাব কেটে গেল, আমার দিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে চললেন, আর ভেবেছিল, বুঝি অন্যভাবে তাকে ভালবাসা নিতান্ত সহজসাধ্য এবং তার পক্ষেও তা প্রীতিকর। কিন্তু এখানেই সে ভুল করেছিল, কারণ কিছুদিনের মধ্যেই আর এক অনুভূতির অস্তিত্ব সে নিজের মধ্যে অনুভব করল। বিষাদের মতই অত্যন্ত গুরুভার হয়ে তা তার হৃদয়ে চেপে বসল, ভয় পেল সে। ভয় পেল এই ভেবে যে তাদের পুরোনো বন্ধুত্বের বুঝি অবসান হয়েছে। তাই সে ঠিক করল, সে অঘটন ঘটবার আগেই সে সরে পড়বে।—এই পর্যন্ত বলে তিনি চোখ রগড়ালেন, তারপর চোখ বন্ধ করে এমন ভাব দেখালেন যেন ব্যাপারটা এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

কেন সে অন্যভাবে ভালবাসতে ভয় করল? হৃদয়াবেগ সংযত করে সহজ গলায় খুব ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম। কথার ধরণে উনি মনে করলেন বুঝি ব্যাপারটায় আমি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ

করিনি; তিনি যে উত্তর দিলেন তাতে মনে হল তিনি আহত

ক বলল, তোমার বয়স অল্প, আমার বয়স হয়েছে। তুমি আমোদ-প্রমোদ ভালবাস, আমার আকর্ষণ অন্যদিকে। তোমার আনন্দে আমি বাধা দেব না, কিন্তু আমাকে তোমার সঙ্গে জড়িয়ো না। যদি আমাকে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে হয় তো আমি একে হালকা ভাবে নিতে পারব না, ফলে আমি অসুখী হব, তুমিও অনুতাপ করবে। তারপর তিনি বললেন, যাই হোক, এসব বাজে কথা। কিন্তু তুমি তো জান কেন আমি যেতে চাই! এ প্রসঙ্গ এবার থাক্, লক্ষ্মীটি!

না না, এই প্রসঙ্গই চলুক। অশ্রুর আবেগে আমার গলা কেঁপে উঠছে। ক তাকে ভালবাসত কি না বল।

তিনি নিরুত্তর।

ভাল যদি নাই বাসত কেন তবে খ-কে ছোট মেয়েটির মত দেখত, কেন ছলনা করত তাকে?

হ্যাঁ, সত্যি অন্যায় করেছে, আমাকে বাধা দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এখন মিটে গেছে, বন্ধুভাবেই ওদের বিচ্ছেদ হয়েছে।

কী ভয়ানক! এর চেয়ে ভাল উপায় কি কিছু ছিল না? কথাটা জিজ্ঞাসা করতে আমার কষ্ট হল। বলে ফেলেই কিন্তু এভাবে কথাটা বলার জন্য অস্বস্তি বোধ করলাম।

হ্যাঁ ছিল। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য তাঁর মুখের ভাবে ফুটে উঠেছে। দুভাবে এর

সমাপ্তি হতে পারত। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, চুপ করে আমার কথা শোনো, বাধা দিয়ো না। কেউ কেউ বলে,—এই পর্যন্ত বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ব্যথাভারাক্রান্ত হাসি হেসে আবার বললেন, কেউ কেউ বলে, ক-র মাথা খারাপ হয়ে গেল; খ-র প্রেমে পাগল সে খ-কে তার মনের কথা জানাল। খ কিন্তু হাসল শুধু, তার কাছে তো এ একটা ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু নয়, যদিও তা ক-র কাছে জীবন-মরণ সমস্যা।

আমি শিউরে উঠলাম, চেষ্টা করলাম ওঁকে বাধা দিতে, ইচ্ছা হল বলি যে আমার পক্ষ নিয়ে কথা বলার দুঃসাহস তাঁর আমি সহ্য করব না। কিন্তু আমার হাত স্পর্শ করে তিনি আমাকে নিরস্ত করলেন। বললেন,

দাঁড়াও। আর যে-ভাবে এ সমস্যার সমাধান হতে পারত সে হল, ক-র জন্য খ-র দুঃখ হল। সংসারে অনভিজ্ঞ বেচারা ভাবল, সত্যিই বুঝি সে তাকে ভালবাসতে পারবে। তাই সে ক-কে বিয়ে করতে রাজি হল। ক-র তখন পাগলের মত অবস্থা; তার ধারণা হল, আবার সে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে। কিন্তু খ ভেবে দেখল যে সে ক-কে প্রতারণা করেছে আর ক-ও তাকে প্রতারণা করেছে···কিন্তু এ আলোচনা এখন থাক্, এ বিষয়ে আর কোনো কথা নয়। তিনি চুপ করলেন, তাঁর কথা ফুরিয়ে গেছে। নীরবে শুধু পায়চারি করতে লাগলেন।

প্রসঙ্গটা তখনকার মত বন্ধ করতে বললেও আমি বুঝলাম, তাঁর সমস্ত কিছু নির্ভর করছে আমার একটা কথার ওপরে। কথা কইতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হৃদয়ের বেদনায় আমার মুখে কথা এল না।

ওঁর দিকে তাকালাম,—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, অধর স্ফুরিত হচ্ছে। ওঁর কথা ভেবে দুঃখ হল। হঠাৎ এক ঝট্‌কায় মৌনের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে ধীরে শুরু করলাম,—ভয় হল, যে কোন মুহূর্তে আমার গলা ভেঙে যেতে পারে—

এ কাহিনীর আরো এক সমাপ্তি সম্ভব। বলে আমি চুপ করলাম, কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। সে হল, ক খ-কে ভালবাসত না, আঘাতের পর আঘাত করল তাকে আর ভাবল, এই বুঝি সে ঠিক করছে। খ-কে সে ত্যাগ করল, ত্যাগ করে গর্ব অনুভব করল।—প্রতারণা করছ তুমি, আমি নয়। আমি ভালবাসছি, প্রথম যেদিন আমাদের দেখা হল সেদিন থেকেই আমি তোমাকে ভালবেসে আসছি—দুবার বললাম কথাটা; 'ভালবাসি' কথাটা উচ্চারণ করবার সময় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গেল, কর্কশ কণ্ঠে এমন চিৎকার করে উঠলাম যে আমি নিজেই চমকে উঠলাম।

ফ্যাকাশে মুখে তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন, ঠোঁট থর্‌থর্ করে কাঁপছে, দু'ধারা অশ্রু গাল বেয়ে নেমে আসছে।

এ অন্যায়! সক্রোধে প্রায় চিৎকার করে উঠলাম আমি, উদ্গত অশ্রু রোধ করতে গিয়ে আমার দম আটকে আসছে। আমি কেঁদে ফেললাম, কেন তুমি এমন কাজ করলে? উঠে পড়লাম, ওঁর কাছ থেকে চলে যাব বলে।

কিন্তু যেতে উনি দিলেন না। আমার হাঁটুতে মাথা রেখে বসে রইলেন, আমার কম্পিত হাত চুম্বন করলেন। তাঁর চোখের জলে আমার হাত ভিজে গেল। ফিসফিস করে বললেন, হা ঈশ্বর, আগে যদি জানতাম!

এই পনেরো দিন আমাদের প্রত্যহ দেখা হয়েছে। প্রতিদিন তিনি ডিনারে আসতেন, থাকতেন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। তিনি বলতেন বটে (এবং আমিও জানতাম কথাটা সত্য) যে আমি ছাড়া তাঁর জীবনে আর কিছু নেই, তবুও কখনো তিনি সারা দিনটা আমার সঙ্গে কাটান নি, দৈনন্দিন কাজকর্মে মন দিতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিয়ের দিন পর্যন্ত প্রকাশ্য ভাবে একরকমই রইল। তিনি আমার হস্তচুম্বন করতেন না, এর পরস্পরের সান্নিধ্য খোঁজা দূরে থাক, আমরা বরং পরস্পরকে এড়িয়েই চলতাম। তার হয়ত ভয় হত, পাছে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমাদের কারো কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কিনা বলতে পারি না, কিন্তু তখন আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁর সমকক্ষ মনে করতাম। যে ছেলে-মানুষির ভান দেখে আমি ওর ওপর বিরক্ত হতাম, তাও আর তখন ওঁর মধ্যে দেখা দিত না। সম্মানিত বয়স্ক ব্যক্তি রূপে তাঁকে না দেখে হাসিখুশি দুরন্ত ছেলেটির মত দেখেই আমি খুসিতে ভরপুর। প্রায়ই মনে হত, ওর সম্বন্ধে কী ভুল ধারণাই না আমার ছিল। ঠিক আমারই মত একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কাই বা তিনি? তাঁর চরিত্রের এক সমগ্র রূপ যেন আমার সামনে ফুটে উঠল, তাকে বুঝতে আর এতটুকু অসুবিধে আমার নেই। তার স্বভাবও কত সহজ সুন্দর, আমার সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ তাঁর মিল। দাম্পত্য জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যা মতলব করেছেন, তার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎস্বপ্নের কোথাও কোনো অমিল নেই, শুধু তাঁর ভাষায় আরো সহজভাবে, আরো সুসম্বদ্ধ হয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে।

আবহাওয়া ভাল না থাকায় আমরা তখন বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ির

ভেতরে কাটাতাম। ঘরের কোনে পিয়ানোটা যেখানে জানলার ধারে রয়েছে, সেই জায়গাটা ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, নিভৃত আলাপের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। মোমবাতির আলো জানলার কাচের উপর পড়ে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। জলের ফোঁটা জানলার চকচকে কাঁচে লেগে গড়িয়ে পড়ছে। ছাদের ওপরে জলের ঝুপঝাপ শব্দ; জলের ধারা নর্দমা দিয়ে সশব্দে নেমে আসছে। জানলার কাছটা হয়ত স্যাঁতসেঁতে কিন্তু আমরা যে-কোনে বসে রয়েছি সে-জায়গাটা বেশ গরম, আলোয় হাওয়ায় বেশ আরামপ্রদই বলতে হবে।

সেই নির্জন কোনে বসে একদিন তিনি বললেন, জানো, একটা কথা আমি ক'দিন থেকেই তোমাকে বলতে চেষ্টা করছি। যতক্ষণ তুমি বাজাচ্ছিলে, ঐ একটা কথাই কেবল আমার মনে মনে ফিরছিল।

"বলতে হবে না, আমি জানি, কী সে কথা।

"বেশ, এই চুপ করলাম।"

না না,—সত্যি কী কথাটা, বলতো?

তবে শোনো। ক আর খ-র সেই গল্পটা মনে আছে তো?

হ্যাঁ, আছে বোধহয়। কিন্তু কী বাজে গল্পটা! গল্পটা যে ওভাবে শেষ হয়েছে, বেঁচেছি!

সত্যি, আর একটু হলেই নিজের দোষে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে বসেছিল, তুমিই আমাকে বাঁচালে। ব্যাপারটা আসলে কী জানো? তখন আমি মিথ্যা বলেছিলাম এবং সেজন্য সত্যিই আমি লজ্জিত। আমার আসল বক্তব্যটা এবার বলে নিতে চাই।

না না, বোলো না, দোহাই তোমার!

ভয় পেয়ো না, আমি শুধু নিজের জবাবদিহি করছি। ভুল যখন করেইছি তখন তর্ক করে বুঝিয়ে দিতে চাই।"

তর্ক করা সবসময়েই ভুল।

ঠিক। আমি ভুল তর্কই করছিলাম। জীবনে অনেকবার হতাশা বরণ করে, অনেক ভুল করে, শেষ পর্যন্ত গ্রামে ফিরে আমার স্থির বিশ্বাস হয়, আমার মনে ভালবাসার উৎস শুকিয়ে গেছে।—এখন শুধু ভদ্রভাবে বুড়ো হয়ে যাওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। অনেকদিনই আমি তোমার প্রতি আমার সঠিক মনোভাবের পরিচয় পাইনি, ভেবে দেখিনি এর কী পরিণতি হতে পারে। কখনো আশা করেছি, কখনো করিনি; কখনো মনে হয়েছে তুমি আমার সঙ্গে ছিনিমিনি খেলছ, আবার কখনো আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে তুমি নিজেই মনস্থির করতে পারছ না। তোমার হয়ত মনে আছে, সেদিন সন্ধ্যার পর যখন আমরা বাগানে বেড়াতে যাই, আমার ভয় হয়েছিল। ভেবেছিলাম, এত সুখও কি কখনো সম্ভব? আশায় ভর করলে পরে যদি হতাশ হতে হয়! তখন আমি হীন স্বার্থপরের মত কেবল নিজের কথাই ভেবে চলেছি।

এই পর্যন্ত বলে তিনি থেমে পড়ে আমার দিকে তাকালেন।

তবে, যা কিছু তখন বলেছি তার সমস্তই যে অর্থহীন তা কিন্তু নয়। এমন আশঙ্কা করা সে অবস্থায় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল, শুধু স্বাভাবিক কেন, যুক্তিযুক্তও বটে। কত কী তোমার কাছ থেকে নিচ্ছি, কিন্তু দিতে পারছি কতটুকু? এখনো তুমি ছেলেমানুষ, অ-স্ফুট কুঁড়ি মাত্র; কখনো প্রেমে পড়নি। আর আমি—

—হ্যাঁ, সত্যি করে বলতো···শুরু করে আমি থেমে পড়লাম, ওঁর উত্তর শুনতে সাহস হল না। তারপর বললাম, না সে থাক।

কী জিজ্ঞাসা করছ, এর আগে কখনো প্রেমে পড়েছি কি না? আমার চিন্তাধারা অনুসরণ করে তিনি বললেন,—সে আমার তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। না—এর আগে কখনো নয়। এখন আমার যা অনুভূতি তেমনটি আর কখনো হয়নি। হঠাৎ যেন এক বেদনার স্মৃতি বিদ্যুৎঝলকের মত তার মনের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। তিনি সখেদে বললেন, না, এ বিষয়েও আমি তোমার অনুকম্পা-প্রত্যাশী—তোমাকে ভালবাসবার অধিকার আমাকে অর্জন করতে হবে। 'তোমাকে ভালবাসি' এ যে আত্মস্বীকৃতি। এ বলা কি সহজ? কীই বা আর তোমাকে দিতে পারি বল, ভালবাসাই তো?

কিন্তু সে কি সামান্য দান? তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

হ্যাঁ গো, তোমাকে দেবার পক্ষে অতি সামান্যই তা। তোমার আছে যৌবন, আছে রূপ। সুখের চিন্তায় কত রাত আমার বিনিদ্র কাটে। ভবিষ্যৎ একত্র জীবনের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকি। জীবনে অনেক কিছুই তো দেখেছি এতদিনে বোধহয় জেনেছি, সুখের জন্য কী প্রয়োজন। পল্লীর নিরালায় শান্তিতে দিন কাটাব, সাধ্যমত সাহায্য করব তাদের যারা আমাদের সাহায্যের প্রত্যাশা নয় অথচ যাদের সাহায্য করা সহজ, তারপর নিজেদের চিন্তা। তারপর থাকবে বিশ্রাম, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ, পড়াশুনো, সঙ্গীত, –থাকবে প্রতিবেশীর প্রতি দরদ। আর সবার ওপরে থাকবে সঙ্গী হিসেবে তুমি, আর হয়ত ছেলেপুলে। এর বেশী আর কী আকাঙ্ক্ষা মানুষের থাকতে পারে?

হ্যাঁ, এই তো যথেষ্ট হওয়া উচিত।

আমার যৌবন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আমার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট। কিন্তু তোমার পক্ষে তা নয়। তোমার সমস্ত জীবন সামনে পড়ে রয়েছে, সুখের সন্ধানে তুমি হয়ত অন্যত্র চেষ্টা করবে। পাবেও হয়ত। এই যে তুমি মনে করছ এতেই প্রকৃত সুখ, এ হয়ত তুমি আমাকে ভালবাস বলেই।

ভুল। ঠিক ঐ ধরণের গ্রাম্য পরিবেশই আমার চিরদিনের স্বপ্ন, আমার জীবনের পরম কাম্য। তুমি যা বললে এ শুধু আমার মনের কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

উনি হাসলেন।

এখন হয়ত তোমার তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু তোমার পক্ষে এ যথেষ্ট নয়, তোমার যে রূপ যৌবন রয়েছে! চিন্তাগ্রস্তভাবে তিনি বললেন।

রূপ যৌবনের নজীর তুলে এভাবে আমাকে অবিশ্বাস করায় আমি ক্রুদ্ধ হলাম। বললাম, কেন তবে তুমি আমাকে ভালবাস? আমার যৌবনের জন্য, না আমার জন্য?

তা বলতে পারি না, তবে তোমায় আমি ভালবাসি। স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

আমি কোন উত্তর করলাম না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর চোখে আমার চোখ পড়ল। হঠাৎ কী যে আমার হল, চারিদিকের কোন বস্তুই আর চোখে পড়ল না, তাঁর মুখটাও যেন একটু একটু করে মিলিয়ে গেল, চোখদুটো শুধু আমার চোখের ওপরে জ্বলজ্বল করতে লাগল। পরক্ষণেই মনে হল, সে চোখদুটোও যেন আমারই মাথায় রয়েছে,—তারপরেই সব গোলমাল হয়ে গেল, কিছুই আর

দেখতে পেলাম না। ওঁর দৃষ্টি আমার মধ্যে যে সুখের ও ভীতির আমেজ এনে দিয়েছিল, সেই অনুভূতি থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার আশায় বাধ্য হয়ে চোখ বন্ধ করলাম…

বিবাহের আগের দিন সন্ধ্যার দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। গ্রাম্ম থেকে যে বৃষ্টির শুরু হয়েছিল তা বন্ধ হল, শারদ সন্ধ্যার প্রকৃত রূপ এই প্রথম আমাদের সামনে প্রকাশ পেল—চারিদিক ভিজে, ঠাণ্ডা, ঝলমলে। এই প্রথম আমরা বাগানে লক্ষ্য করলাম বর্ণবহুল শরতের রূপ, —কোথাও বা নিরাভরণ বিস্তার। আকাশ নির্মেঘ, শীতল, পাণ্ডুর। শুতে গেলাম; একথা ভেবে আনন্দ হল যে কাল আমার বিয়ের দিনটি বেশ সুন্দর হবে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভাঙল। আজই যে সেই শুভদিন, এই চিন্তা যেমন ভয়াবহ তেমনি বিস্ময়কর মনে হল। ঘর:থেকে বেরিয়ে বাগানে গেলাম। সূর্য সবে উঠছে, পথের দুদিকে সারি দেওয়া পত্রবিরল লাইমের হলদে পাতার ফাঁক দিয়ে কোথাও কোথাও সূর্যের আলো এসে পড়ছে। পথে পথে শুকনো পাতার মর্মর, এ্যাশ-বেরি লাল হয়ে, কুঁকড়ে ডালে ডালে ঝুলছে, এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে তুষার-মাথা শুকনো পাতা। ডালিয়াগুলো শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। বাড়ির চারিদিক ঘিরে যে হালকা সবুজ ঘাস আর বার্ডকের ভাঙা ডাল রয়েছে, ভোরের প্রথম আলো তার ওপর রূপোর পাতের মত ঝকমক করছে। আকাশ পরিষ্কার, স্নিগ্ধ; মেঘের লেশমাত্র কোথাও নেই।

সত্যি, আজই তাহলে? নিজেকে প্রশ্ন করলাম,—এত সুখ ঠিক আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না। এও কি সম্ভব যে কাল সকালে আমি ঘুম থেকে উঠব—এ বাড়িতে নয়, থামওয়ালা ঐ অচেনা

বাড়িটায়? এও সম্ভব যে তাঁর আসার পথ চেয়ে আর আমাকে বসে থাকতে হবে না, কাতিয়ার সঙ্গে রাত জেগে বসে তাঁর সম্বন্ধে গল্প করার দিনও কি ফুরোলো? আর কি ড্রয়িং রুমে তাঁর পাশে বসে পিয়ানো বাজাব না,—অন্ধকার রাত্রে উনি বিদায় নেবার পর ওঁর সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা, তারও কি এই শেষ? মনে পড়ল তিনি কাল বলেছিলেন শেষবারের মত একবার দেখা করে যাবেন, আর কাতিয়া আমাকে বিয়ের পোষাকটা একবার পরে দেখতে অনুরোধ করেছিল। পলকের জন্য আমার এ সমস্ত সত্য বলে মনে হল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মন সংশয়ে দুলে উঠল। এও কি সম্ভব যে আজকের দিনটার পর থেকে আমি ও বাড়িতে আমার শাশুড়ির সঙ্গে বাস করব,—নাদেজা, বুড়ো গ্রিগরি বা কাতিয়া কেউ সেখানে থাকবে না? রাত্রে শুতে যাবার আগে কি বুড়ি নার্সকে চুমু খেয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে যেতে পারব না, শুনতে পাব না পুরোনো অভ্যাস মত আমার বুকে ক্রসের চিহ্ন এঁকে প্রত্যুত্তরে বুড়ির শুভরাত্রি জানানো? সোনিয়াকে আর কি পড়াব না, তার সঙ্গে খেলব না, সকালবেলা বাইরে থেকে দেয়ালে শব্দ করে তার মনে ফুর্তির হাসি জাগাব না? আজ থেকে কি আমি এমন একজন হয়ে যাব যে আমার নিজের কাছেই অচেনা, এক নতুন জগৎ কি আমার সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে যেখানে গেলে আমার আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে,—সে নতুন জগৎ হবে কি চিরস্থায়ী? একা বসে এই সব চিন্তা করতে করতে মনমরা হয়ে উঠলাম, অস্থির হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম কখন তিনি আসবেন। অবিলম্বেই তিনি এলেন। আমি যে আজই তাঁর স্ত্রী হতে চলেছি, এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাঁর এ উপস্থিতির প্রয়োজন আমার ছিল। আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

বাবার একটা স্মৃতির উপাসনা পালনের জন্য আমরা ডিনারের আগে হাঁটতে হাঁটতে গির্জায় গেলাম।

আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন! ফেরবার পথে বারবার একথা মনে হয়েছে,—আমার সমস্ত চিন্তা যাঁকে কেন্দ্র করে, তাঁর হাতে ভর দিয়ে আমি চলছি। উপাসনার সময় চ্যাপেলের মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে বাবার কথা চিন্তা করতে করতে বাবার স্মৃতি খুব স্পষ্ট জেগে উঠল। বাবা যে আমার কথা বুঝছেন, এ বিবাহে যে তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে, এ বিষয়ে আমি এতটা নিঃসন্দেহ যে আমার মনে হল যেন বাবার আত্মা অন্তরীক্ষে আমাদের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের আশীর্বাদ করছে। আমার স্মৃতি, আমার আশা-ভরসা, আমার আনন্দ, বিষাদ একত্র হয়ে এক সমাহিত তৃপ্তির অনুভূতি আমার মনে এনে দিয়েছে। সেই তৃপ্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে এই শান্ত নির্মল বাতাসের, এই স্তব্ধতার, ঐ নির্জন প্রান্তর আর ঐ পাণ্ডুর আকাশের, সূর্যের স্নিগ্ধ-রশ্মি যেখান থেকে এসে আমার মুখে জ্বালা ধরাবার চেষ্টায় হতাশ হয়ে সারা প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার সঙ্গীও যেন আমার অনুভূতি উপলব্ধি করেছেন, তাতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ধীরে, নীরবে তিনি চলেছেন, মাঝে মাঝে যখনি তাঁর মুখে তাকিয়েছি, আনন্দ ও বিষাদের মাঝামাঝি এক সুগম্ভীর অভিব্যক্তি সেখানে ফুটে উঠতে দেখেছি। তাঁর এই অভিব্যক্তিতে অংশ গ্রহণ করেছি আমি, করেছে প্রকৃতি।

হঠাৎ তিনি আমার দিকে ফিরলেন। বুঝলাম তিনি কিছু বলতে চান। ভয় হল, এমন প্রসঙ্গের অবতারণা যদি করেন যার চিন্তা আপাতত আমার মনে ঠাঁই পাচ্ছে না? তিনি বাবার কথা তুললেন, কিন্তু তাঁর নাম উচ্চারণ করলেন না।

বললেন, ঠাট্টা করে তোমার বাবা একবার বলেছিলেন,—আমার মাশাকে তোমার বিয়ে করা উচিত।

আজ তিনি থাকলে কত সুখী হতেন! যে হাতে তিনি আমার হাত ধরে ছিলেন সে-হাত আরো কাছে টেনে এনে আমি উত্তর করলাম।

তুমি তো তখন ছোট্টটি,—তিনি বলে চললেন, তাঁর দৃষ্টি আমার চোখে নিবদ্ধ,—ও চোখ দুটি যে আমার ভাল লাগত, সে শুধু তাঁর চোখের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল বলে,—একবারের জন্যও তখন মনে হয়নি যে এমন দিনও কখনো আসতে পারে যখন ও চোখ দুটো তোমার চোখ হিসেবেই আমার এত ভাল লাগবে। তোমাকে আমি মাশা বলে ডাকতাম।...কিন্তু তুমি যে আমার একান্ত আপনার, এই প্রথম আমি তা অনুভব করছি।

পায়ে-হাঁটা পথ বেয়ে আমরা নাড়ার ওপর দিয়ে চলেছি, আমাদের কথাবার্তা আর চলার শব্দ ছাড়া নীরব নিস্তব্ধ চারিদিক। একটা গহ্বর অতিক্রম করে দূরের পত্রবিরল বন পর্যন্ত সেই ক্ষেত প্রসারিত। কিছু দূরে এক চাষী এই মাঠের ওপর আড়াআড়ি ভাবে নিঃশব্দে লাঙল চালিয়ে চলেছে, কালো জমি ক্রমেই প্রসারিত হয়ে উঠছে। পাহাড়ের সানুদেশে ঘোড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে, তাদের মনে হচ্ছে যেন আমাদের কত কাছে! অপর দিকে রয়েছে শীতশস্যের এক ক্ষেত,—গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। শীতশস্যের ওপর যে তুষার জমেছিল, সূর্যকিরণে তা গলে যাওয়ায় কালো রঙ দেখা দিয়েছে, এখানে-ওখানে শুধু সবুজের ছোপ। শীতের রোদ এসে পড়েছে সর্বত্র, সমস্ত প্রকৃতি বড় বড় মাকড়সার জালে ঢাকা। সেই জাল আমাদের ঘিরে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে, নেমে এসে জমা হচ্ছে নাড়া ক্ষেতের

ওপরে, আমাদের চোখে চুলে পোষাকে এসে পড়ছে। আমাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ বাতাসে স্থির হয়ে রয়েছে। সারা জগতে যেন আমারা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, নীল আকাশের এই চন্দ্রাতপের নিচে শুধু আমরা দুজন একা একা,—শীতসূর্যের আলো মিষ্টি হয়ে সেই চন্দ্রাতপের কাণায় কাণায় খেলা করছে, ঝলসে উঠছে থেকে থেকে।

অত জোরে হাঁটছ কেন? তাড়াতাড়ি, প্রায় ফিসফিস করেই আমি বললাম, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আমার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

উনি চলার গতি কমিয়ে দিলেন। যে দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকালেন, আরো স্নেহার্দ্র, আরো আনন্দোজ্জ্বল, আরো তৃপ্ত সে দৃষ্টি।

বাড়ি ফিরলাম। ওঁর মা আর অতিথি-অভ্যাগতের দল সবাই ইতিমধ্যে উপস্থিত। গির্জা থেকে বেরিয়ে নিকল্‌স্কোর গাড়িতে ওঠবার সময় পর্যন্ত আর আমাদের বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ ঘটেনি।

গির্জা প্রায় খালিই ছিল একরকম। আবছায়া মত দেখলাম, ওঁর মা সিধে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর দেখলাম কাতিয়াকে—মাথায় লাল ফিতে বাঁধা টুপি, দু গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আমাদের দু-একজন চাকরও দেখলাম কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাঁর দিকে না তাকিয়েও আমি আমার পাশে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করলাম। প্রার্থনার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে আবৃত্তি করলাম, কিন্তু তার কোন প্রতিধ্বনিই আমার মনে জাগল না। প্রার্থনায় বিফল হয়ে তখন আমি তাকাতে লাগলাম চারিদিকে—দেয়ালের ছবি, বাতি, পুরোহিতের পোষাকের ওপরকার কারুকাজ করা ক্রস, জানলা,—কিন্তু কিছুই আমার অন্তর স্পর্শ করল না। কেবল বোধ হতে লাগল, কি একটা অজানা ব্যাপার যেন আমার ওপর দিয়ে অনুষ্ঠিত

হয়ে চলেছে। সব শেষে পুরোহিত ক্রস হাতে আমার দিকে ফিরলেন, আমাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন, আমি তোমার নামকরণ করিয়েছি, ঈশ্বরের দয়ায় এখন তোমার বিবাহও আমার হাতেই হল। কাতিয়া আর ওঁর মা আমাদের মুখ চুম্বন করলেন। গ্রিগরির গলা শোনা গেল, গাড়ি তৈরি করতে বলছে। আমার কেমন ভয়-ভয় হল, হতাশায় মন ভরে উঠল। সমস্ত তো চুকে গেল, তবু তো অভূতপূর্ব কিছু ঘটল না, —যে শপথ এইমাত্র গ্রহণ করলাম তার উপযুক্ত কোনো পরিবর্তনই তো আমার মধ্যে আসেনি! পরস্পরকে যে চুম্বন করলাম তাও আমার কেমন অদ্ভুত লাগল, আমার মনের ভাব তাতে সঠিক প্রকাশ পায়নি। মনে মনে ভাবলাম, এই কি শেষ?

আমরা গির্জা থেকে বেরোলাম। গাড়ির চাকার শব্দ ছাদের গম্বুজে প্রতিধ্বনিত হল, মুক্ত বাতাস মুখে এসে লাগল। হ্যাট মাথায় দিয়ে তিনি আমাকে হাতে ধরে গাড়িতে তুললেন। জানলা দিয়ে চোখে পড়ল কুয়াসা-ঢাকা চাঁদ, তাকে ঘিরে জ্যোতির বলয়। আমার পাশে বসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি। হঠাৎ একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম, বিবাহের সময় যে প্রতিশ্রুতি তিনি আবৃত্তি করেছিলেন তার ভাষা যেন আমার অপমানজনক মনে হল। কাতিয়ার গলা কানে আসছে, বলছে, আমি যেন মাথায় একটা কিছু চাপা দিই। পাথুরে পথ দিয়ে কিছুক্ষণ সশব্দে চলবার পর গাড়ি নরম রাস্তায় পড়ল। এককোনে জড়সড় হয়ে দূর মাঠের দিকে তাকালাম, চাঁদের শীতল আলো মাখা রাস্তা আমাদের বিপরীত দিকে ধেয়ে চলেছে। তাঁর দিকে না তাকিয়েও আমার পাশে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করলাম। মনে মনে ভাবলাম, যে পরম মুহূর্তের কাছে এতদিন এত কিছু প্রত্যাশা করে

এসেছি, এই কি তার দান? তাঁর এত কাছে এভাবে বসে থাকাটা আমার তখন যেন অসম্মানজনক মনে হচ্ছে। কিছু বলব বলে তাঁর মুখে তাকালাম, কিন্তু কথা এল না,—আমার প্রেম যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে, অসহ্য অনুশোচনা আর আতঙ্কের অনুভূতি সেখানে ফুটে উঠেছে।

আমার দৃষ্টির উত্তরে অনুচ্চস্বরে তিনি বললেন, এই মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো আমার বিশ্বাসই হতে চায়নি যে এও সম্ভব হতে পারে!

কিন্তু কেমন যেন ভয়-ভয় করছে আমার।

ভয়, আমাকে? আমার হাত তুলে নিয়ে সামনে ঝুঁকে তিনি বললেন।

তাঁর হাতের মধ্যে আমার হাত নিস্পন্দ রইল, আমার প্রাণের শীতলতা ক্রমেই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছে।

মৃদুকণ্ঠে বললাম, হ্যাঁ।

সেই মুহূর্তে আমার হৃদ্‌স্পন্দনের গতি দ্রুততর হল, কম্প্রহস্ত তাঁর হাতে চেপে বসল, শরীর উষ্ণ হয়ে উঠল। সেই আধো অন্ধকারে আমার চোখ তাঁর চোখকে খুঁজে ফিরছে। হঠাৎ উপলব্ধি হল, আমি তো তাঁকে ভয় করিনা, এই যে ভীতি এ তো প্রেমেরই রূপান্তর। এক নতুন প্রেম এ, এতদিন যে ভালবেসে এসেছি তার চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ এ প্রেম। আমি যে সম্পূর্ণভাবে তাঁর, এ বোধ আমার হল,—আমার ওপরেই যে তাঁর অধিকার, এর পরিচয় পেয়ে আমি খুসি হলাম।

# দ্বিতীয় খণ্ড

দিন যায়, সপ্তাহ যায়,—পূরো দুটো মাস পল্লীর নির্জনতার মধ্যে কী ভাবে যে কেটে গেল যেন টেরই পেলাম না। অথচ যত অনুভূতি, যত আশ্লেষ, যত সুখ ঐ দুমাসের মধ্যে স্থান পেয়েছে, সারা জীবনের পক্ষে তা যথেষ্ট। গ্রাম্য জীবনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার সঙ্কল্প আমরা করছিলাম মোটেও তা কাজে পরিণত হল না, শুধু এক স্বার্থপর প্রেম আমাদের সম্পূর্ণভাবে পেয়ে বসল, সমস্ত জগতের কথা ভুলে শুধু অকারণ পুলকেই দুজনে সর্বক্ষণ বিভোর হয়ে রইলাম। স্বামী অবশ্য কখনো কখনো পড়বার ঘরে গিয়ে কাজে বসতেন, কখনো বা কোনো কাজে সহরে যেতেন বা জমিদারির তদারক করতেন। কিন্তু সেটুকু সময়ের জন্যও আমার কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে তাঁর যে কী কষ্ট হত সে আমি নিজে দেখেছি। পরে তিনি আমার কাছে স্বীকারও করেছেন যে আমি না থাকলে যে-কোনো কাজই তাঁর কাছে নিতান্ত অর্থহীন হয়ে উঠত, তিনি তাতে একটুও মন বসাতে পারতেন না। আমার অবস্থাও তদ্রূপ। হয়ত পড়াশুনো করছি কিংবা পিয়ানোয় বসেছি বা ওঁর মা-র কাছে বসে রয়েছি কিংবা হয়ত স্কুলে পড়াতে বসেছি,—এ সমস্ত কাজই আমি করতাম কেবল এই কারণে যে এ সমস্ত কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র আছে বা এতে তাঁর সর্বান্তঃকরণ সম্মতি আছে। কিন্তু যখনি এমন কোনো কাজে হাত দিয়েছি যার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, সঙ্গে সঙ্গে আর সে কাজে আমার মন বসেনি। তিনি ছাড়াও যে কোন-

কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব, এ চিন্তা পর্যন্ত তখন আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হত। হয়ত এ ধারণা আমার ভুল, এ আমার স্বার্থপরতা ; কিন্তু এতেই আমি সুখী হতাম, জগতের সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে বড় মনে হত। পৃথিবীতে শুধু তিনিই আমার জন্য আছেন, পৃথিবীর সবার শ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ ত্রুটিলেশ হলেন তিনি। তাই একমাত্র তিনি ছাড়া আর কোনো কিছুর জন্যই জীবনধারণ করা আমাদের পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল, আমার সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা তিনি পোষণ করেন সেই ধারণাকে নিজের জীবনে সার্থক করে তোলা। তাঁর চোখেও যে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা নারী, সবপ্রকার গুণের আধার! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের এই অভিমতের উপযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তোলাই তখন আমার জীবনে একমাত্র বাসনা ছিল।

একদিন, আমি তখন প্রার্থনা করছি, তিনি আমার ঘরে এলেন। তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে আমি আবার প্রার্থনায় মন দিলাম। আমাকে বাধা না দিয়ে তিনি টেবলে বসে একটা বই খুললেন। আমার মনে হল তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাই আমি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলাম। দৃষ্টি বিনিময় হতেই তিনি মুচকি হাসলেন, আমিও হেসে উঠলাম। আমার প্রার্থনা বন্ধ হল।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার প্রার্থনা হয়ে গেছে?

হ্যা, কিন্তু তুমি থামলে কেন? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

তুমি প্রার্থনা কর তো?

তিনি উত্তর করলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন, এমন সময় আমি বাধা দিলাম। বললাম, কথা রাখ লক্ষ্মীটি, আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দাও।

তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, খুব গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করবার পর প্রার্থনা শুরু করলেন। প্রার্থনা করেন, আর থেকে থেকে আমার মুখের দিকে তাকান, সমর্থনসূচক কোনো চিহ্ন যদি সেখানে ফুটে ওঠে।

ওঁর প্রার্থনা শেষ হতে আমি হেসে ওঁকে আলিঙ্গন করলাম।

আমার হাত চুম্বন করে লজ্জারক্ত মুখে তিনি বললেন, মনে হচ্ছে আমি যেন দশ বছরের ছেলেটি হয়ে পড়েছি। শুধু তোমারই জন্য আমার এ পরিবর্তন।

আমাদের বাড়িটা হল সেইধরণের সাবেকি গ্রাম্য বাড়ি যেখানে বংশপরম্পরায় সবাই একই সংসারে একত্র বাস করে এসেছে, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছে। বংশের প্রাচীন ধারার পরিচয় এ-বাড়ির সবত্র মাখানো রয়েছে; এখানে প্রবেশমাত্র আমিও সেই ধারার অঙ্গাঙ্গীভূত হয়ে গেলাম। কাজকর্মের তদারক করতেন আমার শাশুড়ি তাতিয়ানা সেমিনোভ্‌না, তিনিও প্রাচীন ধারার পক্ষপাতি। লালিত্য বা সৌন্দর্যবোধের বিশেষ ছাপ সে ধারায় না থাকলেও, ভৃত্য থেকে আসবাব পত্র, খাদ্যবস্তু পর্যন্ত সবত্রই ছিল প্রাচুর্যের পরিচয়, আর ছিল সর্বাঙ্গীন পরিচ্ছন্নতা, ছিল সুশৃঙ্খলা। ড্রইংরুম পরিপাটি ভাবে সাজানো ছিল; দেয়ালে ছবি, মেঝেয় ঘরে তৈরি কার্পেট, মাদুর। মর্নিং রুমে ছিল এক পুরোনো পিয়ানো, ব্রোঞ্জে কাজ করা কয়েকটা টেবল। শাশুড়ির বিশেষ নির্দেশে বাড়ির সেরা আসবাবপত্র আমার ঘরে ছিল—কত ডিজাইনের, কত কালের পুরোনো সে সব আসবাব। তার মধ্যে ছিল একটা পুরোনো আয়না। প্রথম প্রথম ঐ আয়না দিয়ে দেখতে আমার

ভয় হত, যদিও অবশ্য পরে পুরোনো বন্ধুর মতই তা আমার আপন হয়ে গেছে। তাতিয়ানা সেমিনোভ্‌নার গলা কখনো শোনা যেত না বটে, কিন্তু তবুও বাড়ির সমস্ত কাজ ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত এগিয়ে চলত। বাড়িতে দাসদাসীর সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত; (তারা সবাই গোড়ালি-ছাড়া, নরম জুতো পরত, কারণ আমার শাশুড়ি গোড়ালির খটখট আর জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ আদপেই পছন্দ করতেন না) সকলেই নিজ নিজ চাকুরির জন্য গব অনুভব করত, বুড়ি গিন্নিকে দেখলে ভয়ে কাঁপত, আর আমার স্বামীকে আর আমাকে যে স্নেহ করত তার মধ্যে কর্তামির সুর ছিল। বেশ মন দিয়েই তারা কাজকর্ম করত। প্রতি শনিবার ঠিক নিয়ম মত মেঝে পরিষ্কার করা হত, কার্পেটের ঝাড়াঝাড়ি হত। প্রতিমাসের পয়লা তারিখে কিছু ধর্মকর্ম হত, সর্বত্র পূত বারি সিঞ্চিত হত। আমার শাশুড়ি আর তাঁর ছেলের জন্মদিনে (এবং সেই শরৎকাল থেকে আমার জন্মদিনেও) সমস্ত পল্লীকে আপ্যায়িত করা হত। আমার শাশুড়ি এ-বাড়িতে আসা থেকেই এ সমস্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে।

বাড়ির কাজকর্মে আমার স্বামী কোন অংশগ্রহণ করতেন না, চাষবাস আর জনমজুরদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন; এতেই তাঁর অনেকটা সময় নিয়োজিত হত। শীতকালে পর্যন্ত এত প্রত্যূষে তিনি উঠতেন যে প্রায়ই ঘুম ভেঙে দেখতাম, তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন। প্রভাতী চায়ের সময় তিনি সাধারণত ফিরতেন, সে চায়ে অংশগ্রহণ করতাম শুধু তিনি আর আমি। এমনি বিরল ক্ষণটিতে, বিশেষ করে চাষবাসের দুশ্চিন্তা না থাকলে তখন তিনি আনন্দে সোহাগে উচ্ছল হয়ে উঠতেন,—ঠিক যেন, বন্য উন্মাদনা। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম ভোর থেকে

তিনি কী করেছেন, এবং তাহার উত্তরে তিনি এমন সব অসম্ভব হিসেব দাখিল করতেন যে হাসতে হাসতে আমার চোখে জল আসত। কখনো বা বলতাম, না সত্যি করে বল,—তখন তিনি হাসি চেপে বলতেন। আমি শুধু ওর ঠোঁট নাড়া লক্ষ্য করতাম, কিছুই মন দিয়ে শুনতাম না। ওঁকে চোখের সামনে পাওয়া, ওঁর কথা শোনা, এতেই আমার যথেষ্ট আনন্দ হত।

কথা কইতে কইতে হয়ত কখনো বলে উঠলেন, হ্যা, কী বলছিলাম যেন, ধরিয়ে দাও তো একটু! কিন্তু আমি কিছুতেই ধরিয়ে দিতে পারতাম না। আমি ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন, এ তখন আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে হত। বহির্জগতের সমস্ত ঘটনাবলীর প্রতি আমরা যেন সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে উঠেছিলাম। তাঁর কাজকম বুঝতে চেষ্টা করা বা তাতে উৎসাহিত হওয়া এর অনেক পরের ঘটনা।

শাশুড়ি ডিনারের আগে কখনো আসতেন না, প্রাতরাশও তিনি একাই সারতেন আর লোক মারফৎ আমাদের গুড-মর্ণিং জানাতেন। আমাদের দুজনের সঙ্কীর্ণ পরিধির সঙ্গোপনে, মত্ত সুখের মধ্যে যখনি তাঁর সুশৃঙ্খল রাজ্যের কোনো বার্তা এসে পৌছত, আমরা একেবারে চমকে উঠতাম। আমি তো প্রায়ই সংযম হারিয়ে ফেলতাম, কখনো বা নিঃশব্দে হেসে উঠতাম দাসী যখন এসে আমার সামনে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আউড়ে যেত—মা ঠাকরুণ আমাকে খোঁজ করতে পাঠালেন কাল রাত্রে আপনাদের কেমন ঘুম হয়েছিল, তাঁর কথাও তিনি আমাকে বলতে বললেন, সারারাত তাঁর শরীরের এক পাশে যন্ত্রণা হচ্ছিল আর একটা পাজি কুকুর গ্রামে চিৎকার করছিল, তিনি ঘুমোতে পারেন

নি ;—আরো জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন আজ সকালের রুটিটা আপনার কেমন লেগেছে,—রুটি আজ বানিয়েছে নিকলাস্কা, তারাস নয়—এই প্রথম সে রুটি বানালো ;—সেঁকার কাজটা ওর মোটেই মন্দ নয়,—ক্র্যাকনেলগুলো অবশ্য ভালই করেছে, কিন্তু চা-টা একটু বেশী ফুটিয়ে ফেলেছে।

ডিনারের আগে আমাদের বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ হত না, তিনি হয় লেখার কাজ করতেন কিংবা আবার বেরোতেন, আর আমি পিয়ানো নিয়ে বসতাম বা পড়াশুনো করতাম। কিন্তু ডিনারের আগে, চারটের সময় আমরা ঠিক ড্রইং রুমে মিলিত হতাম। তাতিয়ানা সেমিনোভ্‌না তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন। বাড়িতে দু'তিনজন দরিদ্র, দয়াশীলা মহিলার কখনো অপ্রতুল হত না, তাঁরাও ঐ সময় আসতেন। আমার স্বামীর বহুদিনের অভ্যাস মাকে হাতে ধরে ডিনারে নিয়ে যাওয়া,—এর কখনো ব্যতিক্রম হত না। কিন্তু শাশুড়ি চাইতেন, তাঁর অপর হাতটা আমি ধরি। ফলে এই হত, দরজার কাছে এসে আমরা আটকে গিয়ে পরস্পর ধাক্কা খেতাম। খাবার টেবলে শাশুড়ি প্রধান আসন গ্রহণ করতেন ; কথাবার্তা একটু গুরুগম্ভীর হলেও তা হত নম্র, স্বাভাবিক। এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে যে হালকা কথাবার্তা হত, তা বেশ উপভোগ করতাম। মাঝে মাঝে মায়ে-ছেলেয় যে বচসা হত কথা-কাটাকাটি হত, তাতেও বেশ মজা লাগত। ওঁদের মধ্যে যে প্রগাঢ় স্নেহের সম্বন্ধ রয়েছে, এই তো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ!

ডিনারের পর শাশুড়ি পার্লারে যেতেন, একটা চেয়ারে বসে হয়ত নস্যি গুঁড়ো করতেন কিংবা বইয়ের পাতা কাটতেন, আর আমরা জোরে জোরে বই পড়তাম কিংবা মর্নিং রুমে গিয়ে পিয়ানোয়

বসতাম। এই সময় আমরা একসঙ্গে বসে অনেক পড়াশুনো করেছি বটে, কিন্তু তবু সঙ্গীতই ছিল আমাদের অধিক প্রিয়, তাতেই আমরা আনন্দ পেতাম সবচেয়ে বেশি। আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে সর্বদাই যেন নতুন নতুন তারের সংযোজন হচ্ছে, নতুন করে আবার আমরা নিজেদের কাছে বিকশিত হচ্ছি। ওঁর প্রিয় সুরগুলো আমি বাজিয়ে চলেছি, দূরে একটা সোফায় উনি বসে আছেন, আমার দৃষ্টির প্রায় অগোচরে। এই সঙ্গীতের ফলে তাঁর মধ্যে যে ভাবান্তর উপস্থিত হত তা তিনি সঙ্গোপনেই রাখতে ভালবাসতেন, প্রকাশ করতে লজ্জা হত তাঁর। অনেকবার এমনও হয়েছে যখন তাঁর অজ্ঞাতসারে আমি পিয়ানো ছেড়ে উঠে তাঁর কাছে গিয়ে দেখেছি ভাবাবেগের অভিব্যক্তি তাঁর চোখেমুখে ফুটে ওঠে কিনা, অশ্রুসজল দুচোখে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায় কি না। শাশুড়ির কথনো কখনো আমাদের দেখতে ইচ্ছে হত, কিন্তু তিনিও সবসময়ে লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমরা কোন রকমে বিরক্ত না হই। কতকটা নির্লিপ্ত ভাব বজায় রেখে, যেন কত ব্যস্ত এইভাবে তিনি ঘরের ভেতর দিয়ে চলে যেতেন; কিন্তু আমি তো জানি, নিজের ঘরে গিয়ে অত শীগগির আবার ফিরে আসার তাঁর কোনো দরকার ছিল না। প্রতি সন্ধ্যায় আমি বড় ড্রইং রুমে বসে চা পরিবেশন করতাম। তখন আবার সবাই একত্র হত। চকচকে সামোভার থেকে চা পরিবেশন করবার সময় যে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হত, বহুদিন পর্যন্ত আমি তাতে নার্ভাস হয়ে পড়তাম। অতবড় সামোভারের কল খুলে দেওয়া, নিকিতার ডিশে গ্লাসটা রাখবার সময় বলে দেওয়া – 'পিটার ইভানোভিচের জন্য' কিংবা 'মারিয়া মিনিচ্‌নার জন্য', চিনি ঠিক হয়েছে

কিনা জিজ্ঞাসা করা, নার্স-টার্সদের জন্য চিনি আলাদা করে রাখা—এতটা সম্মানের যোগ্য নিজেকে আমি মনে করতাম না, মনে হত আমি অত্যন্ত চপলমতি, ও বয়স আমার এখনো হয়নি। স্বামী অবশ্য প্রায়ই আমাকে উৎসাহিত করতেন,—বাঃ বাঃ, চমৎকার, ঠিক যেন পাকা হাতের কাজ! কিন্তু তাতে যেন আমি বরং আরো বিব্রত হয়ে পড়তাম।

চা-পর্বের পর শাশুড়ি হয় পেশেন্স খেলতেন, কিংবা মারিয়া মিনিচ্‌নার কাছে ভবিষ্যদ্বাণী শুনতেন—তাস দেখে এ ভবিষ্যদ্বাণী হত। এর পর তিনি আমাদের মুখচুম্বন করে ক্রস এঁকে দিতেন, আর আমরা ঘরে চলে যেতাম। সাধারণত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আমাদের গল্প চলত। সারা-দিনের মধ্যে এই সময়টিই ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয়। তিনি তাঁর অতীত জীবনের গল্প করতেন। কত পরিকল্পনা আমরা করতাম, কখনো কখনো দর্শন নিয়ে পর্যন্ত আলোচনা হত। পাছে আমাদের কথা ওপর থেকে শোনা যায় আর আমার শাশুড়ির কানে পৌঁছোয়, সেই ভয়ে আমরা ফিসফিস করে কথা কইতাম, কারণ শাশুড়ি রাত জাগা পছন্দ করতেন না। ক্ষিদে পেলে চোরের মত ভাঁড়ার ঘরে যেতাম, নিকিতার সাহায্যে কিছু ঠাণ্ডা খাবার জোগাড় করে বসবার ঘরে বাতি জ্বেলে বসে খেতাম। মস্ত পুরোনো বাড়িটায় আমরা একরকম অপরিচিতের মতই বাস করতাম; সেখানে অতীতের আপোষহীন আধিপত্য, আমার শাশুড়ির একচ্ছত্র ক্ষমতা। কেবল আমার শাশুড়িই নন,—ভৃত্যের দল, আসবাবপত্র, এমন কি দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো পর্যন্ত আমার মনে এক সম্ভ্রমের ভাব এনে দিত, সম্ভ্রমের সঙ্গে কিছুটা আতঙ্কও মেশানো ছিল। কেবলই মনে হত, তিনি আর আমি যেন এ বাড়ির সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছি না,—যা কিছু আমরা করতে চাই, খুব

সাবধানে অত্যন্ত সন্তর্পণে তা করতে হবে। এ কথা উঠতে এখন মনে হচ্ছে,—সেই একঘেয়ে নিয়মনিষ্ঠা, সেই অলস অনুসন্ধিৎসু ভৃত্যের দল,—এ সমস্তই আমার অস্বস্তিকর, এমন কি অত্যাচার বলেই মনে হত। সে সময় কিন্তু সেই কড়াকড়িই আমাদের প্রেমকে নিবিড়তর করে তুলেছিল। আমার মত তিনিও কোনো কিছুতেই প্রত্যক্ষভাবে আপত্তি তুলতেন না, কোথাও কোনো অসুবিধে হলে বরং চোখ বুজে সহ্য করে যেতেন। আমাদের এক কর্মচারী, ডিমিট্রি সিদোরভ, খুব ধূমপান করত। প্রতিদিন ডিনারের পর আমরা যখন মর্নিং রুমে বসতাম, স্বামীর পড়বার ঘরে সে তামাক চুরি করতে যেত। আমার স্বামী আর আমি পা টিপে টিপে তার পিছু নিতাম, স্বামীর মুখে ফুটে উঠত উল্লাস আর ভীতির মাঝামাঝি একটা অবস্থা। চোখ টিপে ইঙ্গিতে আমাকে সাবধান করে দিয়ে তিনি ডিমিট্রি সিদোরভকে দেখিয়ে দিতেন,—আমরা যে এ ভাবে তাকে লক্ষ্য করছি, ঘুণাক্ষরেও সে তা টের পেত না। ফিরে যাবার সময়ও যখন ডিমিট্রি আমাদের লক্ষ্য করত না, ব্যাপারটা নির্ঝঞ্ঝাটে ঘটে যাবার জন্য তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে (এ প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারের পরই হত) আমাকে আদর করে চুমু খেতেন। তাঁর এই চুপ করে থাকার ব্যাপারে, সমস্ত কিছুর ওপর এই উদাসীনতায় আমি বিরক্ত হতাম, মনে হত, এ একটা দুর্বলতা ছাড়া কিছু নয়। এ কথা কিন্তু একবারও মনে হত না যে আমি নিজেও সেই একই অপরাধে অপরাধী। ছোট ছেলেরা তাদের মতলব গোপন রাখবার জন্য যেমন করে, তাঁর ব্যাপারটাও যেন কতকটা সেই রকম।

ওঁর এই দুর্বলতায় আমি আশ্চর্য হয়েছি শুনে উনি একদিন বললেন, বল কি! আমার মত সুখী ব্যক্তির কি কোন ব্যাপারে বিরক্ত হওয়া

সম্ভব ? আমি তো এই বুঝি যে পরের ওপরে জোর খাটানোর চেয়ে পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। এমন কোনো অবস্থার উদ্ভব হতে পারে না যখন মানুষের পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়,—আর আমাদের তো অফুরন্ত সুখ! মন্দ বলে কিছুই আমার কাছে নেই, কোনো কিছুতে রাগ করা বা কাউকে কটু কথা বলা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। মন্দ কিছু দেখলে এখন আমার শুধু দুঃখ হয়, হাসি আসে। বললে হয়ত বিশ্বাস হবে না, কোনো চিঠি পেয়ে, এমনকি সকালে ঘুমিয়ে উঠে পর্যন্ত কখনো কখনো আমি ভয় পেয়ে উঠি। জীবনের স্রোত ঠিক বয়েই চলবে, পরিবর্তন যেখানে যেভাবেই হোক না কেন; বর্তমানের চেয়ে ভাল অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না।

তাঁর এসব কথা না বুঝলেও আমি বিশ্বাস করতাম। আমার সুখের অভাব ছিল না, এবং আমাদের তখনকার অবস্থায় তা নিতান্ত স্বাভাবিক বলেই আমার মনে হয়েছিল। বিশ্বাস করতাম—অন্য কোথাও, জানিনা সে কোথায়, এক অন্য ধরণের সুখ আছে। সে সুখ আমার বর্তমান সুখের চেয়ে বেশী না হলেও সে এক সম্পূর্ণ অন্য ধরণের সুখ।

দুটো মাস কেটে গেল, চরম প্রখরতা নিয়ে, তুষার নিয়ে এল শীতকাল। তাঁর সঙ্গ সত্ত্বেও আমার নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগল। জীবনযাত্রা একঘেয়ে বোধ হচ্ছে, ওঁর মধ্যে বা আমার নিজের মধ্যেও নূতনত্বের কোনো সন্ধান পাচ্ছি না, কেবল পুরোনো দিনের পুনরাবৃত্তি। তিনি কাজকর্মে বেশী করে মন দিলেন, যার ফলে তাঁকে আমার কাছ থেকে আরো বেশীক্ষণ দূরে-দূরে থাকতে হল। আমার একটা ধারণা ছিল যে তাঁর মনে এমন একটা নিভৃত কোণ আছে যেখানে তিনি

আমাকে প্রবেশ করতে দিতে চান না। এই পুরোনো ধারণা আবার আমার মনে আশ্রয় করল। ওঁর এই নিরবচ্ছিন্ন অন্যমনস্কতায় আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমাদের ভালবাসা অবশ্য অক্ষুণ্ণই রয়ে গেল, কিন্তু আমার প্রেম আর বৃদ্ধি না পেয়ে রয়ে গেল পূর্ববৎ। অস্বস্তিকর এক নতুন চেতনা আমার মনে মাথা চাড়া দিতে লাগল। ভালবেসে যে সুখ পেয়েছি, তারপর আর আমার ভালবাসা শুধু তাঁর ওপরে নিবদ্ধ রেখেই তৃপ্তি হয় না। আমি চাই গতি, এই শান্ত জীবনের ধারা আমার পছন্দ নয়। চাই উত্তেজনা চাই বিপর্যয়, প্রেমের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। প্রাণশক্তির যে প্রবল প্রাচুর্য নিজের মধ্যে অনুভব করতাম, আমাদের শান্ত জীবনে তার বহিঃপ্রকাশের সুযোগ ছিল না। কখনো কখনো এমন বিমর্ষ হয়ে উঠতাম যে আমার নিজেরই লজ্জা করত, আমার এ মনোভাব তাঁর কাছে গোপন রাখতে চেষ্টা করতাম। আমার অত্যধিক কোমলতায় বা উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে কখনো বা তিনি শঙ্কিত হতেন। আমার মনের এই অবস্থা আমার চেয়েও আগে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাই বললেন, চল পিটার্সবার্গে যাই। কিন্তু আমি রাজি হলাম না, বললাম, এ মতলব ছেড়ে দাও, জীবনের ধারা যেমন চলছে তেমনি চলুক। এতে পরিবর্তন এনে কেন এ সুখে বিঘ্ন ঘটানো? সুখী আমি একথা সত্য, কিন্তু যন্ত্রণা হত এই ভেবে যে, এ সুখলাভের জন্য আমাকে কোনো কষ্ট করতে হয় নি, কোনো ক্ষতি পর্যন্ত স্বীকার করতে হয় নি। অথচ এই উভয়প্রকার বিঘ্নের সম্মুখীন হবার ক্ষমতা যে আমার আছে, একথা চিন্তা করতেই মন ব্যথিয়ে ওঠে। আমি তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসি এবং জানি, আমার

চিন্তা ছাড়া অন্য কিছুই তাঁর মনে স্থান পায় না। কিন্তু আমি চাই, অন্য সকলেও দেখুক আমাদের এই ভালবাসা। আমাদের পথে বাধা দেখা দিক, সেই বাধাকে জয় করে আমি তাঁকে ভালবাসব, এই ছিল আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার মন, আমার ইন্দ্রিয় পর্যন্ত সর্বদা তৃপ্ত থাকত বটে, কিন্তু যৌবনসুলভ আর এক অনুভূতি, পরিবর্তনের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছিল, আমাদের শান্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে তার তৃপ্তি পেতাম না। একথা কেন উনি বললেন যে যখন খুসি আমরা সহরে যেতে পারি? একথা যদি না বলতেন তো হয়ত আমার এ অস্বস্তিকর অনুভূতিকে এক অর্থহীন মারাত্মক রোগ বলেই ধরে নিতাম। মনে করতাম, যে আত্মাহুতির কথা চিন্তা করছি তার সময় হয়েছে, আমার এ মনোভাব জয় করার মধ্যেই হবে তার প্রকাশ। গ্রাম ছেড়ে বেরোতে পারলেই আমার এ বিষণ্ণতা দূর হবে—এ ধারণা আমার মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে বসল, অথচ তাঁর প্রিয় পরিবেশ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই চিন্তাকে আমার অত্যন্ত স্বার্থপর, অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার বলে মনে হল। দিন এগিয়ে চলল, আরো পুরু হয়ে পড়ল তুষার। আমাদের নিঃসঙ্গ জীবন তেমনি মন্থরভাবেই চলতে লাগল। অথচ আমি জানি আমাদের বাইরে আছে কলরবমুখর পৃথিবী, আছে আড়ম্বরের প্রাচুর্য, আছে উত্তেজনা; অসংখ্য মানুষ দুঃখসুখের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে, আর আমরা কোথায় এক কোণে পড়ে আছি, আমাদের কথা ভুলেও কখনো কারো মনে স্থান পায় না। সবচেয়ে অসহ্য হল এই চিন্তা যে লোকাচারের আওতায় পড়ে আমাদের জীবন এক নির্দিষ্ট আকারে গড়ে উঠছে, মনের স্বাধীনতা হারিয়ে আমরা

কালের নিস্তরঙ্গ গতির কাছে দাসখত লিখে দিয়েছি। সকালটা আমাদের বেশ প্রফুল্লমনেই কাটত, ডিনার সুষ্ঠুভাবে সমাধা হত, আর সন্ধ্যা কাটত স্নেহের কোমল ছায়ায়। মনে হত, পরোপকারে আত্মনিয়োগ করা, সাধুভাবে জীবন যাপন করা,—এসব যা তিনি বলেন বেশ ভাল সন্দেহ নেই; কিন্তু এর জন্য তো সময় পড়ে আছে, অথচ এমন অনেক কিছুই বাকি যা এখনি না হলে আর পরে সম্ভব নয়। এই যে জীবন, এ তো আমার কাম্য নয়;—আমি চাই সংঙ্ঘাত, চাই হৃদয়াবেগের হাতে জীবনের হাল ছেড়ে দিতে—জীবন হৃদয়াবেগ নিয়ন্ত্রণ করবে, এ ইচ্ছে আমার নয়। এক গভীর গহ্বরের মুখে যেন আমি পড়েছি, এক পা বাড়ালেই, সামান্য নড়াচড়াতেই পতন অনিবার্য—সেই রক্ত-জমাট-করা পরিস্থিতিতে তিনি আমাকে ধরে ফেলবেন—আমাকে নিয়ে চলে যাবেন যেখানে খুসি। এমনটি অবস্থাই আমার একান্ত কাম্য।

মনের এই অবস্থার ফলে আমার শরীর পর্যন্ত খারাপ হতে চলল, আমাকে স্নায়ুর রোগে ধরল। একদিন সকালের কথা বলছি, সেদিন আবার আমার শরীরটা একটু বেশী খারাপ। জমিদারি দপ্তর থেকে তিনি ফিরলেন, তাঁর মধ্যে যে ভাবান্তর লক্ষিত হল তেমনটি আগে কখনো হয়নি। ব্যাপারটা সঙ্গেসঙ্গেই আমার নজরে পড়েছিল, জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে। কিন্তু তিনি গোপন করতে চাইলেন, বললেন ও কিছু নয়। পরে শুনেছিলাম, আমার স্বামীর প্রতি বিদ্বেষবশে পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আমাদের কৃষাণদের ওপরে জুলুম করেছে, তাদের ভয় দেখিয়েছে। স্বামী আর সহ্য করতে পারেন নি,—সহানুভূতিসূচক দুয়েকটা কথা বলে উড়িয়ে

দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে আঘাত পেয়েছিলেন বলেই নাকি তিনি একথা আমার কাছে গোপন করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হল, আমাকে ছেলেমানুষ মনে করেন বলেই তিনি তা আমার কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন, তাঁর এ-সব ব্যাপার আমার বোধগম্য হবে না। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম, এবিষয়ে আর কোনো কথা তুলিনি। মারিয়া মিনিচ্‌না তখন আমাদের ওখানে বাস করত, চাকরকে বললাম তাঁকে যেন প্রাতরাশে পাঠিয়ে দেয়। খুব তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমি মারিয়াকে নিয়ে সোফারুমে গেলাম, এমন একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলাম যে-বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্রও উৎসাহিত নই। তিনি ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, আর থেকে থেকে তাকাতে লাগলেন আমাদের দিকে। তখন আমার ইচ্ছে হল আরো বকবক করি, এমন কি, খিলখিল করে হেসে উঠতে পর্যন্ত ইচ্ছে হল। আমি নিজে যা বললাম, মারিয়া মিনিচ্‌না যা বলল, সমস্তই আমার অত্যন্ত হাস্যকর মনে হচ্ছে। একটা কথাও না বলে তিনি পড়বার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। যখন আর তাঁর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তর্কের সমস্ত উৎসাহ সঙ্গে সঙ্গে আমার দূর হয়ে গেল। এভাবে হঠাৎ চুপ করে যাওয়ায় মারিয়া আশ্চর্য হয়ে গেছল, জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা কী? ওর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আমি একটা সোফায় বসে পড়লাম, উচ্ছ্বসিত অশ্রুতে আমার চোখ ভরে উঠেছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, কী উনি এত গোপন করছেন? নিশ্চয় সামান্য কোনো ব্যাপার, যাকে উনি এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। কিন্তু কথাটা যদি আমাকে খুলে বলতেন তো আমি নিশ্চয়

তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে ব্যাপারটা আসলে নিতান্ত সামান্য। কিন্তু আমি যে কিছু বুঝি না, এ ধারণা তিনি কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারবেন না,—রাজকীয় গাম্ভীর্য বজায় রেখে তিনি আমাকে তাচ্ছিল্য করতেই থাকবেন ; তাঁর স্থির ধারণা, যেন যে-কোনো বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, আর আমি যা কিছু করি তার আগাগোড়াই সমস্ত ভুলে ভরা। কিন্তু এই যে জীবন আমার কাছে ক্লান্তিকর, অর্থহীন বোধ হচ্ছে এ তো ভুল নয়! এই একঘেযে পরিবেশের আবেষ্টনীতে বদ্ধ থেকে চোখের ওপর দিয়ে জীবনের মন্থর পদক্ষেপ লক্ষ্য করা— এর পরিবর্তে যদি আমি উৎসবমুখর প্রাণচঞ্চল জীবন পছন্দ করি, জানি, তাহলেও আমি ভুল করব না। অথচ আমার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা তো তাঁর পক্ষে একটুও কঠিন নয়! আমাকে সহরে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই, আমি চাই তিনি আমারই মত হোন, কোনো জবরদস্তির বাধা টেনে এনে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করে শুধু সহজ সরলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুন। এই যে আমার বাসনা, এর মূলেও তো তাঁরই প্রেরণা, তাঁরই উৎসাহ। অথচ তিনি নিজেই এখন জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। এইখানেই হচ্ছে যত মুস্কিল।

আমার চোখ জলে ভরে আসছে, বিরক্তিতে মন ভরে উঠছে। এই বিরক্তি তো ভাল লক্ষণ নয়! কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল, ওঁর পড়বার ঘরে গেলাম। উনি টেবলে বসে লিখছিলেন, আমার পায়ের শব্দে মুহূর্তকাল মুখ তুলে তাকিয়ে আবার লেখায় মন দিলেন। ওঁর শান্ত ভাব লক্ষ্য করে মনে হল, যেন কিছুই হয়নি। ওঁর চাউনি আমার ভাল লাগল না, সোজা কাছে না গিয়ে আমি

টেবলের ধারে দাঁড়িয়ে একটা বই খুলে ওলটাতে শুরু করলাম। লেখা বন্ধ করে তিনি আর একবার আমার দিকে তাকালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, মাশা, তোমার কি অসুখ করেছে ?

এর উত্তরে আমি কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম, যার অর্থ, খুব তো বিনয় জান তুমি, কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করবার অর্থ কী ? উনি মাথা নেড়ে সলজ্জ হাসি হাসলেন, কিন্তু এই প্রথম তাঁর হাসির উত্তরে আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, আজ তোমার কী হয়েছে বল তো ? কেন তুমি আমাকে ব্যাপারটা খুলে বললে না ?

উনি বললেন, যৎসামান্য, নোংরা ব্যাপার একটা। তবে, এখন আমি কথাটা তোমাকে বলতে পারি। আমাদের দুজন ভৃত্য সহরে চলে গেছে—

কিন্তু আমি ওঁকে বলতে দেব না। বললাম,

—প্রাতরাশের সময় যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন বল নি কেন ?

তখন আমার মেজাজ ভাল ছিল না, রাগের মাথায় হয়ত বোকার মত কিছু বলে ফেলতাম, সেই ভেবে বলি নি।

তখন আমার জানবার ইচ্ছে হয়েছিল।

কেন ?

এ কথা কেন তোমার মনে হয় যে কোন বিষয়েই আমি তোমাকে সাহায্য করবার উপযুক্ত নই ?

আমাকে সাহায্য করবার উপযুক্ত নও! কলম নামিয়ে তিনি বললেন, আমার তো বিশ্বাস, তোমাকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকাই অসম্ভব! শুধু যে সব কাজে আমার সহায় হও তাই নয়, তুমি নিজেই

তো আমার কাজ করে দাও! তুমি যা বলছ আসল ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। এই পর্যন্ত বলে তিনি হেসে উঠলেন, বললেন, আমার জীবন তো তোমার ওপরেই নির্ভর করে রয়েছে, যা কিছু আমার ভাল লাগা সে তো শুধু তুমি আছ বলেই। তুমি না হলে আমার চলে না বলেই তো—

জানি আমি। আমি তো ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি, আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠাণ্ডা রাখাই দরকার।

কথাটা আমি এমন ভাবে বললাম যে তিনি আশ্চর্য হলেন। এমন ভাবে তাকালেন, যেন এমনটি আগে কখনো শোনেন নি। আমি বলে চললাম, তোমার জীবনে একমাত্র কাম্য হল শান্ত ভাবে দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া, কিন্তু অমন নিস্তরঙ্গ জীবন আমার পছন্দ নয়।

আচ্ছা, তাড়াতাড়ি আমাকে বাধা দিয়ে তিনি শুরু করলেন, মনে হল আমাকে আর এভাবে বেশী কথা বলতে দিতে তাঁর ভয় হচ্ছে। সমস্ত ঘটনাটাই তোমাকে আনুপূর্বিক বলব, কিন্তু সব শোনবার পর আমি তোমার মতামত জানতে চাই।

এখন আর আমার তা শোনবার উৎসাহ নেই। কথাটা শোনবার জন্য আসলে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম, কিন্তু তাঁর নির্বিকার ভাব নষ্ট করতে আমার খুব ভাল লাগছিল। বললাম, জীবন নিয়ে খেলা আমার ভাল লাগে না, আমি চাই বাঁচতে, তোমার মত আমার প্রাণেও বেঁচে থাকবার প্রবল বাসনা রয়েছে।

মনের প্রতিটি অনুভূতির ছবি তাঁর মুখের ভাবে প্রতিফলিত হত, সেখানে এখন ফুটে উঠল গভীর বেদনা আর অখণ্ড মনোযোগের ছবি।

আমি বলে চললাম, আমি তো চাই তোমার জীবনে অংশ গ্রহণ

করতে···কিন্তু আর আমি অগ্রসর হতে পারলাম না, গভীর বেদনার ছায়া তাঁর মুখে ফুটে উঠল। মুহূর্তকাল নীরব থেকে তিনি বললেন, আমার জীবনের কোন্ কাজে তুমি অংশগ্রহণ করো না? ইন্স্পেক্টর আর আধ-মাতাল কৃষাণদের ঝক্কি আমি একা বয়ে বেড়াচ্ছি, এজন্য কি তুমি একথা বললে?

শুধু সে-জন্য নয়।

ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা কর, লক্ষ্মীটি। আমি জানি উত্তেজনায় যন্ত্রণা আছে, এ বোধ আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই হয়েছে। তোমাকে আমি ভালবাসি, ভালবাসি বলেই উত্তেজনা থেকে আড়ালে রাখতে চাই। তোমার ভালবাসাই আমার জীবনের প্রধান উপজীব্য, আমার জীবন তুমি অসম্ভব করে তুলো না।

তোমার তো কখনো কোনো কিছুতেই ভুল হয় না। ওঁর দিকে না তাকিয়ে আমি বললাম।

ওঁর এই ধীর শান্ত ব্যবহারে আমি আবার বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম, একটা অস্বস্তির ভাব, অনুশোচনার মত একটা অনুভূতি নিজের মধ্যে অনুভব করলাম।

কী হয়েছে বল তো মাশা? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের মধ্যে কে দোষী আর কে নির্দোষ, আদবেই তা প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হচ্ছে, আমার বিরুদ্ধে তোমার কী নালিশ? সময় নাও, ভেবে চিন্তে তোমার মনের কথা জানাবে। আমার ওপরে অসন্তুষ্ট হয়েছ তুমি, এবং খুব সম্ভব এ ক্ষেত্রে তোমার ভুল হয় নি। কিন্তু আমাকে বুঝতে দাও কোথায় আমার ভুল হয়েছে।

কিন্তু মনের কথা আমি কী করে প্রকাশ করি? উনি যে সঙ্গে-সঙ্গেই আমাকে বুঝতে পেরেছেন, আবার যে আমি ওঁর কাছে সেই ছেলেমানুষটিই হয়ে গিয়েছি! এমন কোন কিছুই তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় যা তিনি বুঝবেন না বা আগে থেকেই আন্দাজ করবেন না! এসব চিন্তা আমাকে আরো উত্তেজিত করে তুলল।

বললাম, তোমার কাছে আমার কোনো নালিশ নেই। এ জীবন আমার অত্যন্ত একঘেয়ে লাগছে, এই একঘেয়েমি আমার একটুও ভাল লাগে না। কিন্তু তুমি তো বলছ এর কোনো প্রতীকার নেই, আর তুমি যখন বলছ তখন আর তাতে সন্দেহ কী?

কথাটা বলবার সময় আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, ওঁর মুখে সে প্রশান্তির চিহ্ন আর নেই। বেদনা আর আশঙ্কার ছাপ সেখানে স্পষ্ট ফুটে রয়েছে।

মাশা—নিম্ন, ক্লিষ্টস্বরে তিনি শুরু করলেন, এ তো সামান্য ব্যাপার নয়, আমাদের সারা জীবনের সুখদুঃখ এর ওপরে নির্ভর করছে। আমার কথা শোনো, উত্তর কোরো না। কেন তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিতে চাও বল তো?

আমি বাধা দিলাম। বললাম, জানি, শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হবে যে তোমার কথাই ঠিক। আর কথায় প্রয়োজন নেই, তুমি যা বলছ আমি নিঃসন্দেহে মেনে নিচ্ছি। অত্যন্ত নীরস স্বরে কথাগুলো বললাম, কোনো দুষ্ট আত্মা যেন আমার কণ্ঠে ভর করেছে।

যদি শুধু বুঝতে তুমি কী করতে চলেছ! বলতে বলতে তাঁর গলা কেঁপে উঠল।

আমি আর থাকতে পারলাম না, কেঁদে উঠলাম। খানিকটা

কাঁদবার পর মনটা একটু হালকা হল। তিনি পাশে বসে রইলেন, কোনো কথা কইলেন না। ওঁর জন্য আমার দুঃখ হল, কৃতকর্মের জন্য আমি বিরক্ত হলাম, লজ্জা পেলাম। সযত্নে ওঁর দৃষ্টি এড়িয়ে চললাম, কারণ আমার স্থির ধারণা হল, ওঁর দৃষ্টিতে তখন নিশ্চয় দ্বিধা কিংবা কঠোরতা ফুটে উঠেছে। ওঁর দিকে তাকালাম শেষ পর্যন্ত। কোমল শান্ত দৃষ্টি মেলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, সে দৃষ্টিতে যেন ক্ষমার প্রার্থনা। তাঁর হাত হাতে নিলাম, বললাম,

ক্ষমা কর। নিজেই জানিনা আমি কী বলছি।

কিন্তু আমি জানি। আর জানি তুমি যা বলছ ঠিকই বলছ।

তার মানে?

মানে, আমাদের পিটার্সবার্গে যেতেই হবে। আর আমাদের এখানে থাকা চলবেনা।

সে তুমি যা বলবে।

দুহাতে জড়িয়ে ধরে তিনি আমাকে চুম্বন করলেন। বললেন, ক্ষমা কর মাশা, দোষ সত্যিই আমার।

সে দিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে পিয়ানো বাজালাম, বারান্দায় পায়চারি করতে করতে তিনি শুনতে লাগলেন। নিজের মনে বিড়বিড় করা তাঁর এক অভ্যাস ছিল, যখনই জিজ্ঞাসা করেছি কী বিড়বিড় করছ, প্রতিবারই প্রথমে একটু চিন্তা করে তারপর উত্তর দিয়েছেন। সাধরণত কোনো কবিতা বা অর্থহীন কিছু তিনি বিড়বিড় করে আবৃত্তি করতেন বটে, কিন্তু তা থেকেই তাঁর মেজাজ আন্দাজ করতে পারতাম। এবার জিজ্ঞাসা করতে মুহূর্তকাল চিন্তা করে লার্মন্টভের দুটো লাইন আবৃত্তি করলেন—

'মত্ত সে ঐ ঝড়ের করে আবাহন,

স্বপ্ন দেখে, ঝড়ের বুকেই শান্তি আছে তার।'

ভাবলাম, সত্যি অসাধারণ উনি, সব জানেন। এমন লোককে কি ভাল না বেসে থাকা যায় ?

আমিও উঠে পড়লাম, ওঁর হাতে হাত মিলিয়ে এক সঙ্গে পায়চারি করতে লাগলাম। চেষ্টা করলাম ওঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে।

কী ? হেসে আমার দিকে তাকিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

কই কিছু না তো ? ফিসফিস করে আমি বললাম। খুসির জোয়ার হঠাৎ আমাদের দুজনকে ভরিয়ে তুলল, চোখে হাসি ফুটল, হালকা পা ফেলে এগিয়ে চললাম। আমাদের এভাবে চলা দেখে রাঁধুনি বিরক্ত হল, শাশুড়ি পার্লারে বসে পেশেন্স খেলছিলেন, আমাদের দেখে আশ্চর্য হলেন। ঐ ভাবে আমরা ড্রইংরুম পর্যন্ত গেলাম, তারপর থেমে দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লাম।

এর দিনপনেরো পরেই ক্রিসমাসের আগে আমরা পিটার্সবার্গে পৌঁছে গেছি।

পিটার্সবার্গ যাত্রা, মস্কোতে একসপ্তাহ কাটানো আর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করা, নতুন বাড়িতে গুছিয়ে বসা, দেশভ্রমণ, নতুন নতুন সহর নতুন নতুন লোক দেখা—এ সমস্ত যেন স্বপ্নের মতই চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল ! এই আনন্দময় পরিবেশ, বৈচিত্র্যময় এই সৌন্দর্য তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর ভালবাসার ছোঁয়ায় পরম রমণীয় হয়ে উঠল,—যে গ্রাম্য জীবন ছেড়ে আমরা এসেছি, এ জীবনের

তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ বলেই তাকে মনে হল। আমার ধারণা ছিল অভিজাত সমাজের বাসিন্দারা অত্যন্ত গর্বিত, হৃদয়হীন ; কিন্তু তার বদলে এখানে এসে সর্বত্রই সহৃদয় অন্তরঙ্গতার পরিচয় পেয়ে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমিই যেন এখানে সকলের চিন্তার বস্তু, আমাকে পেয়েই যেন সবার আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর একটা ব্যাপারেও আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম যে, সমাজের সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় বলে যাদের মনে হত তাদের অনেকেই আমার স্বামীর পরিচিত। অথচ একবারও তো তিনি আমার কাছে তাঁদের কথার উল্লেখ করেন নি! বরং তাদের কয়েক জনের সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পেয়ে আমি যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম, বিরক্তও হয়েছিলাম তেমনি, কারণ তাঁদের কাছে আমি যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে এসেছি। তাঁর এই বিরূপ মনোভাবের কারণ আমি খুঁজে পেতাম না। পরিচিতদের মধ্যে এমন অনেককে তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলতেন যাঁরা আমাদের রীতিমত খোসামোদ করতেন। বুঝতে পারিনা তাঁর এই ব্যবহার, সহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে যত বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় ততই তো ভাল।

গ্রাম ছেড়ে আসবার সময় তিনি বলেছিলেন, দেখ, এইভাবে আমাদের চলতে হবে। এখানে আমরা হয়ত ছোটখাট রাজাবিশেষ, কিন্তু সহরের আবহাওয়ায় কেউ আমাদের বিশেষ ধনী মনে করবে না। তাই ঠিক করেছি, ঈস্টারের পর আর আমরা ওখানে থাকব না। অভিজাত সমাজেও আমাদের বেশী মেলামেশা করা চলবে না, কারণ তাহলে মুস্কিলে পড়বার সম্ভাবনা আছে। এই যে সঙ্কল্প আমি করছি এ তোমার ভালোর জন্যও বটে।

আমি বললাম, সমাজে কেন মিশতে যাব আমরা? আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করব, থিয়েটারে যাব, অপেরায় যাব, ভাল ভাল গান শুনব। এসব সেরে ঈস্টারের আগেই আমরা ফিরতে পারব।

এসব সদিচ্ছা কিন্তু পিটার্সবার্গে পা দিতে-না-দিতেই একেবারে ভুলে গেলাম। আনন্দোচ্ছল নতুন জগতে এসে পড়েছি, চারিদিকের ফুর্তি আর লোভনীয় আকর্ষণের মধ্যে কখন নিজের অগোচরেই পুরোনো জীবনকে পেছনে ফেলে এলাম, ভুলে গেলাম তার সাধু-সঙ্কল্প, তার মহান আদর্শ। মনে হল, এতদিন যেন শুধু জীবন নিয়ে খেলা করেই এসেছি, সে যেন বর্তমান জীবনের প্রস্তুতিমাত্র, প্রকৃত জীবন এতদিনে আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যে অস্থিরতা, যে বিষণ্ণ ভাব গ্রামে থাকবার সময় আমাকে ঘিরে থাকত, ম্যাজিকের মতই যেন তা কোথায় মিলিয়ে গেল। স্বামীর প্রতি ভালবাসা অনেক শান্ত হল, তাঁর ভালবাসায় ভাঁটা পড়েছে কি না এ চিন্তাও আর আমার মনে স্থান পায় না। তাঁর প্রেমে আমার সন্দেহের অবকাশ রইল না; আমার প্রতিটি চিন্তা তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতেন, প্রতিটি অনুভূতিতে অংশগ্রহণ করতেন, আমার যে কোনো অভাব তিনি পূর্ণ করতেন। তাঁর যে প্রশান্তি আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল যদিই বা এখনো তার লেশমাত্র তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট থাকে তো তাতে আর আমি বিরক্ত হই না। আজ বুঝি, শুধু যে তিনি আমাকে ভালবাসেন তাই নয়, আমার গর্বেও তিনি গর্ব অনুভব করেন। হয়ত কারো সঙ্গে দেখা করতে গেছি বা নতুন কারো সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কিংবা হয়ত কোনো সান্ধ্য মজলিসে অতিথি-পরিচর্যার ভার নিয়েছি,—পাছে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হয় এই ভয়ে মনে মনে কেঁপে উঠেছি।

অনুষ্ঠান সমাধা হবার পর তিনি আমার অনেক প্রশংসা করেছেন, বলেছেন, নিখুঁত কাজ হয়েছে। ওঁর এ প্রশংসায় আমি খুব উৎসাহ পেয়েছি। আমরা এখানে আসবার কিছুদিন পরে তিনি মাকে একটা চিঠি লেখেন। ঐ সঙ্গে আমাকেও কিছু লিখতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি নিজে কী লিখেছেন কিছুতেই দেখাতে চাইলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর শেষপর্যন্ত রাজি হলেন। লিখেছেন, 'মাশাকে দেখলে আর তুমি চিনতে পারবে না মা,—আমি নিজেই পারি না। এত মাধুর্য, এত সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও কোথা থেকে শিখল? সত্যি, ওকে প্রশংসা করবার ভাষা আমার নেই। এখন থেকে আমি ওকে আরো বেশি ভালবাসব,—যদি অবশ্য তা কখনো সম্ভব হয়।'

ভাবলাম, এতদিনে তাহলে আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলাম, মনে হল তাঁকে যেন আরো বেশি ভালবাসছি। নবপরিচিতের সঙ্গে আলাপেও এমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম যে নিজেরই আশ্চর্য লাগল। চারিদিকেই শুনি, অমুক খুড়োর আমাকে খুব পছন্দ হয়েছে, কিংবা অমুক খুড়ি শতকণ্ঠে আমার প্রশংসা করেছে। একজনের কাছে শুনলাম, পিটার্সবার্গের মহিলামহলে আমার সমকক্ষ কেউ নেই, এবং এক মহিলার অভিমত এই যে, ইচ্ছে করলে নাকি আমি পিটার্সবার্গের ফ্যাসন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমার স্বামীর এক মধ্যবয়সী আত্মীয়া, কোন্ কুমার বাহাদুরের কেতাদুরস্ত স্ত্রী, প্রথম দর্শনেই আমাকে খুব পছন্দ করে ফেললেন, তাঁর প্রশংসাবাণীতে আমার মাথা ঘুরে গেল। প্রথম যেদিন তিনি আমাকে একটা নাচের আসরে নিমন্ত্রণ করে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন, স্বামী আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন

আমি যেতে চাই কি না—একটা চাপা হাসি যেন তাঁর ঠোঁটের ওপর দিয়ে খেলে গেল। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম, অনুভব করলাম, আমার মুখচোখ আরক্ত হয়ে উঠেছে।

সহজভাবে হাসতে হাসতে স্বামী বললেন, মনের ইচ্ছেটা যেভাবে প্রকাশ করলে তাতে মনে হয় যেন মস্ত একটা অপরাধ স্বীকার করছ!

কিন্তু তুমিই যে বলেছিলে আমরা সমাজে মিশব না, আর তুমি নিজেও তা পছন্দ কর না! অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

খুব যদি ইচ্ছে হয় তো চল, যাওয়াই যাক।

আমি চুপ করে রইলাম।

উনি বললেন, সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে মেশাটাই যে খারাপ তা নয়, কিন্তু সামাজিকতার ফলে যে অতৃপ্ত কামনার উদ্ভব হয়, অত্যন্ত কদর্য তার রূপ। অবশ্য এ নিমন্ত্রণ আমাদের রক্ষা করা উচিত, এবং আমরা তা করব।

সত্যি বলতে কি, আমি বললাম, এই নাচের আসরে যাবার জন্য আমার মনে যে প্রবল বাসনা জেগেছে, এমনটি আগে কখনো অনুভব করিনি।

নাচের আসরে সেদিন যে আনন্দ পেলাম, আশার অতীত সে আনন্দ। মনে হল, শুধু আমাকে কেন্দ্র করেই এই সমারোহ, আলোকোজ্জ্বল এই বিরাট হলঘর। এই যে বিপুল জনসমাগম, এ শুধু আমাকে প্রশংসা করবার জন্যই। সামান্য পরিচারিকা থেকে আমার নাচের পার্টনার, নাচঘরের বৃদ্ধের দল পর্যন্ত, সকলেরই চলনে-

বলনে যেন এই একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে তারা সবাই আমাকে ভালবাসে। আত্মীয়ের কাছে শুনলাম, আমার সম্বন্ধে জনসাধারণের মত হল, গ্রাম্য সরলতার যে মাধুর্য আমার মধ্যে রয়েছে, সে আ মার সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই প্রশংসায় উৎসাহিত হয়ে আমি স্বামীকে বললাম, আরো দু-তিনটে নাচের আসরে যোগ দেব, তাহলেই আমার নাচের ওপর বিতৃষ্ণা আসবে। বললাম বটে বিতৃষ্ণা আসবে, কিন্তু আমার মনের কথা তা নয়।

সঙ্গে-সঙ্গে উনি রাজি হয়ে গেলেন, এবং প্রথম প্রথম বেশ শান্ত মনেই আমার সঙ্গে সামাজিক উৎসবে যোগ দিলেন। আমার সাফল্যে খুসি হলেন তিনি, তাঁর সাবধানতার বাণীই ভুলে গেলেন হয়ত, কিংবা হয়ত তাঁর মতই পালটে গেল।

এইভাবে দিন চলতে চলতে ক্রমে একসময় মনে হল, তিনি যেন এই জীবনযাত্রায় অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছেন। এসব চিন্তা করবার মত মনের অবস্থা অবশ্য তখন আমার ছিল না; যদিবা কখনো তাঁর স্থির, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করেছি, তার অর্থ আমার বোধগম্য হয়নি— পরিচিত মণ্ডলীর এই অযাচিত অকুণ্ঠ প্রশংসা আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। বিলাসবাসনের, মার্জিত রুচির, নূতনত্বের এই অভিনব আবহাওয়ায় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। এই সুখকর পরিস্থিতির মধ্যে, যারা আমার স্বামীর সমকক্ষ বা তাঁরও চেয়ে উচ্চপদস্থ তাদের সান্নিধ্যে আসা সত্ত্বেও যখন আমি নিবিড়ভাবে, আরো স্বচ্ছন্দে তাঁকে ভালবাসতে পারছি, তখন তো এই জীবনধারায় তাঁর বাধা দেবার কিছু নেই। নাচের আসরে প্রবেশ করা মাত্র যখন সবার দৃষ্টি আমার ওপর আকৃষ্ট হয়, এক নতুন ধরণের গর্বে, পরম

তৃপ্তিতে আমার মন ভরে ওঠে। আর তিনি? আমাকে নিজের বলে সর্বসমক্ষে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেই হয়ত তখন তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে গিয়ে কালো কোটের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। ঘরের এক কোণে তাঁর বিষণ্ণ মূর্তি আবিষ্কার করে কতবার নিজের মনে বলেছি,—দেরি কর একটু, বাড়ি ফিরি, তখন বুঝবে কার জন্য আমার এ রূপ, সুন্দর হবার এ সাধনা; এই যে সান্ধ্য মজলিস, আমার ওপর এর আকর্ষণ কিসের। সত্যি বিশ্বাস করতাম, এই যে আমি সাফল্যে উল্লসিত হয়ে উঠছি, এ শুধু এই ভেবে যে, তাঁরই জন্য আমি এ সমস্তই আবার ছেড়ে দিতে পারব। একমাত্র ভয়, যদি কোনো নতুন আলাপীর সঙ্গে আমার মেলামেশা কিছু ঘনিষ্ঠ হয় তো হয়ত কিছুটা ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর একান্ত বিশ্বাস আর সাংসারিক বিষয়ে পরম উদাসীনতা লক্ষ্য করে, এবং অন্য যুবকদের তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পেয়ে এ আশঙ্কাও আর আমার রইল না। কিন্তু তবুও অভিজাত সমাজের এত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে আমি তৃপ্তি বোধ করেছি, আমার অহমিকা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। স্থির বিশ্বাস হয়েছে, স্বামীর প্রতি আমার যে প্রেম, নিতান্ত অর্থহীন তা কখনই নয়। এই বিশ্বাসের ফলে তাঁর প্রতি আমার আচরণ আরো স্বচ্ছন্দ, আরো সহজ হয়ে উঠল। একদিন নাচের আসর থেকে ফিরে এসে আমি তাঁর বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করে খেলাচ্ছলে বললাম, ওঃ, মাদাম এন্-এর সঙ্গে খুব উৎসাহের সঙ্গে কথা কইছিলে তো! পিটার্সবার্গের অভিজাত সমাজের সুপরিচিত এই মহিলার সঙ্গে তিনি সে দিন কথা কয়েছিলেন।

ওভাবে কথা কওয়ার তোমার কী অর্থ মাশা? ভ্রূ কুঁচকে, দাঁতে দাঁত চেপে এমন ভাবে তিনি একথা বললেন, মনে হল যেন কথা কইতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। বললেন, ও ধরণের কথা অন্য লোকে বলে বলুক, তোমার আমার মধ্যে অমন কথাটি নয়। আমার মনে এখনো আশা আছে আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধে আবার ফিরে আসবে, কিন্তু এ ধরণের প্রবঞ্চনার ফলে হয়ত তা একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

লজ্জায় আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

তোমার কি মনে হয় মাশা, আবার তা ফিরে আসবে?

নষ্ট তো হয়নি, নষ্ট হবার জিনিষ ও নয়, ওঁর কথার উত্তরে আমি বললাম। কথাটা আমার তখনকার মত সত্যই মনে হয়েছিল।

ভগবান করুন তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু তা যদি না হয় তো আমাদের এখন দেশে ফেরাই উচিত।

এ ধরণের কথা অবশ্য এই একবারই তাঁর মুখে শুনেছিলাম, তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হত, আমার মত তাঁরও মনে কোথাও কোনো ক্ষোভ জমা হয়ে নেই। আমি তো ফুর্তিতেই আছি। যদি বা এ জীবন ক্বচিৎ কখনো তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হয় তো এই ভেবে মনকে প্রবোধ দিলাম যে দেশের বাড়িতেও তো তেমনি আমার এতদিন পরম বিরক্তিতেই কেটেছে। আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে যদি বা কোনো পরিবর্তন ঘটে থাকে তো দেশে গিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে কিছুদিন বাস করলেই আবার তা ঠিক হয়ে যাবে।

শীতটা এভাবেই কেটে গেল, কিন্তু আগের ব্যবস্থার কথা ভুলে আমরা ঈস্টার পর্যন্ত পিটার্সবার্গেই রয়ে গেলাম। ঈস্টারের এক সপ্তাহ পরে আমাদের তল্পিতল্পা গুছোনো শুরু হল। বাঁধাছাঁদা শেষ হল,

বাগানের জন্য চারা গাছ, আর দেশের লোকদের জন্য উপহার সামগ্রীও কেনা শেষ হল। এ কাজে তাঁকে বেশ উৎসাহিত দেখলাম, আমার সঙ্গে যেন বেশ একটু ঘনিষ্ঠও হয়ে উঠলেন। এমন সময় প্রিন্সেস ডি এসে উপস্থিত হলেন, অনুরোধ করলেন আমরা যেন শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করে যাই, যাতে কাউণ্টেসের উৎসব-সভায় যোগ দিতে পারি। আমি যাতে সে সভায় যোগ দিই এ ব্যাপারে কাউণ্টেস খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। এক বিদেশী প্রিন্স নাকি কোন্ নাচের আসরে আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক এবং শুধু আমাকে দেখবার জন্যই নাকি তিনি এ সভায় যোগদান করছেন। তার মতে আমি নাকি সমস্ত রাশিয়ার সেরা সুন্দরী। পৃথিবীর সমস্ত দেশের গন্যমান্য ব্যক্তি সে সভায় উপস্থিত থাকবে, সুতরাং আমার অনুপস্থিতি নাকি পরম হতাশার ব্যাপার হয়ে পড়বে।

ড্রইংরুমের আর-এক কোণে বসে আমার স্বামী অন্য একজনের সঙ্গে কথা কইছিলেন।

তাহলে তুমি যাচ্ছ তো, মেরি? প্রিন্সেস জিজ্ঞাসা করলেন।

পরশু যে আমাদের যাবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে! স্বামীর দিকে তাকিয়ে অনিশ্চয়ভাবে আমি বললাম। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই তিনি তখনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

ওঁকে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাচ্ছি। আচ্ছা বেশ, তাহলে তো আমরা উৎসবে যোগ দিয়ে সকলের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারব?

বললাম, কিন্তু আমাদের সমস্ত ব্যবস্থাই যে ওলটপালট হয়ে যাবে! বললাম বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই যেন আমি ওঁর কথায় প্রায় রাজি হয়ে পড়েছি।

ঘরের অপর কোণে যেখানে ছিলেন সেখান থেকে তিনি প্রিন্সেসকে বলে উঠলেন, ও বরং আজ গিয়ে প্রিন্সকে অভিনন্দন জানিয়ে আসুক। বিরক্তি চেপে যেভাবে তিনি কথাটা বললেন, তেমনটি তাঁর মুখে আগে কখনো শুনিনি।

নিশ্চয় হিংসে হচ্ছে ওঁর, এবং জীবনে হয়ত এই প্রথম—হাসতে হাসতে প্রিন্সেস বললেন, কিন্তু সার্জি মিখায়েলিচ, শুধু তো প্রিন্সের জন্য নয়, আমাদের সকলের তরফ থেকেই আমি এ অনুরোধ করছি। কাউণ্টেসও খুব আশা করে আছেন।

যাওয়া না যাওয়া সম্পূর্ণ ওর ইচ্ছাধীন। নীরস কণ্ঠে কথাটা বলে স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওঁকে উত্তেজিত দেখে আমার কষ্ট হল, আমিও প্রিন্সেসকে কোন কথা দিলাম না। অতিথি বিদায় নিলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি চিন্তাগ্রস্তভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন, আমার পা-টিপে-টিপে যাওয়া তিনি দেখতে বা শুনতে পেলেন না।

আমি মনে মনে বললাম, ইতিমধ্যেই তিনি প্রিয় নিকল্‌স্কোর স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছেন। আলোকোদ্ভাসিত ড্রইং রুমে প্রাতঃকালীন কফির কথা, জমি জমা রায়ত, সঙ্গীতমুখর সন্ধ্যা, মধ্যরাত্রে গোপনে খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টা,—এসবের মধ্যেই এখন তাঁর মন পড়ে রয়েছে। তখনি মনে মনে ঠিক করলাম, পৃথিবীর সমস্ত উৎসব, সমস্ত প্রিন্সের আকর্ষণেও আমি ওঁর এই পরম সুখবিহ্বল মুহূর্তে বাধার সৃষ্টি করব না। এ নাচে আমি যেতে চাই না,—এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছি,—একথা ওঁকে বলতে যাব, এমন সময় তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভ্রূ-কুঞ্চিত হল, মুখের প্রশান্তি কোথায় দূর হয়ে গেল।

সেই পুরোনো সতর্কতার ছবি, সেই গুরুজনোচিত ভঙ্গি আবার সেখানে ফুটে উঠল। সাধারণ মানুষ হিসেবে তিনি আমার কাছে ধরা দিতে চান না, প্রায় দেবতার আসন গ্রহণ করে নিজেকে সর্বদা আড়াল করে রাখতে চান।

আমার দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কী খবর বল?

উত্তর করলাম না। তাঁর যে সত্তাকে আমি ভালবেসে এসেছি তাকে গোপন করে নিজেকে এভাবে আড়ালে রাখবার এই প্রয়াসে আমি আহত হলাম।

শনিবারের এই নিমন্ত্রণে তুমি যেতে চাও? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

যেতে তো ইচ্ছে হয়, কিন্তু তোমার যে মত নেই! তাছাড়া আমাদের সমস্ত গুছোনো হয়ে গেছে। এমন নীরস কণ্ঠে কথা কইতে আগে কখনো তাঁকে শুনিনি, এমন কঠোর দৃষ্টিতে তাকানোও এই তাঁর প্রথম।

সমস্ত আবার খুলে ফেলতে বলছি। মঙ্গলবার পর্যন্ত আমরা থাকব, সুতরাং চাও তো উৎসবে যোগ দিতে পার। আশা করি তুমি যাচ্ছ। আমি কিন্তু যাব না।

আমার দিকে না তাকিয়ে তিনি উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলেন।

বুঝতে পারছি না তোমাকে, তাঁর দিকে দৃষ্টি রেখে সেখানে দাঁড়িয়েই আমি বললাম, তুমি তো বল তুমি কখনো সংযম হারাও না, (একথা কিন্তু তিনি সত্যিই কখনো বলেন নি) তাহলে কেন এমন অদ্ভুতভাবে কথা কইছ? তোমার খাতিরে তো আমি এ সুখ

ত্যাগ করতে প্রস্তুত, কেন তবে তুমি এই অস্বাভাবিক, বিদ্রূপভরা স্বরে আমাকে এ উৎসবে যোগ দিতে বলছ ?

ও, তুমি সুখ ত্যাগ করছ বুঝি? 'ত্যাগ করছ' কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে তিনি বললেন, বেশ তো, আমিও না হয় তাই করছি—এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? আমাদের মধ্যে উদারতার প্রতিযোগিতা চলেছে,—দাম্পত্য সুখের কী অপূর্ব উদাহরণ আমরা !

এমন কর্কশ, ঘৃণা মাখানো কথা তার কাছে কখনো শুনিনি। শুধু লজ্জিত নয়, আমি মর্মাহত হলাম।

আমারও আচরণে রূঢ়তা ফুটে উঠল। যাঁর কাছ থেকে সর্বদা মনখোলা সহৃদয় ব্যবহার পেয়ে এসেছি, কৃত্রিমতাকে যিনি চিরদিন ভয় করে এসেছেন, এমন ব্যবহার কী ভাবে তাঁর পক্ষে সম্ভব ? আর, কী আমার অপরাধ যে উনি এভাবে কথা কইছেন ? অথচ তাঁর জন্য আমি এতখানি নির্দোষ আনন্দ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ! এক মুহূর্ত পূর্বেও আমি তাঁকে ভালবেসেছি, তাঁর মনোভাব যথারীতি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। সরল ব্যবহার তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন, কিন্তু আমি তো তা চাই না !

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, অনেক বদলে গেছ তুমি। কী অপরাধ আমি করলাম ? এ আমন্ত্রণ নয়, নিশ্চয় আমার ওপর তোমার কোনো পুরোনো নালিশ আছে। এ কপট ব্যাবহার কেন, নিজেই তো তুমি কপটতাকে ভয় করতে ! সহজ করে বল তো কী তোমার অভিযোগ ?

ভাবতে লাগলাম, কী বলবেন উনি ? আত্মপ্রসাদ পেলাম এই ভেবে

যে, সারা শীতকালের মধ্যে এমন কোনো কাজই আমি করিনি যা তাঁর কাছে অন্যায় মনে হতে পারে।

ঘরের মাঝখানটায় গিয়ে দাঁড়ালাম, যাতে আমার পাশ দিয়ে তাঁকে চলতে হয়। তাঁর দিকে তাকালাম। আশা হল তিনি এসে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরবেন আর তাহলেই সব মিটে যাবে,—দুঃখ হল এই ভেবে যে এক্ষেত্রে দোষ যে তাঁর, তা প্রমাণ করবার সুযোগ পেলাম না। কিন্তু তিনি দূরের কোণে থেমে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনো কি তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না?

না।

তাহলে বুঝিয়ে বলতে হবে। আমি যা অনুভব করছি—যা আমি অনুভব না করে পারি না, সে কথা চিন্তা করে জীবনে এই প্রথম আমার অত্যন্ত বিরক্ত লাগছে। এই বলে তিনি থামলেন, কণ্ঠস্বরের তিক্ততায় তিনি নিজেই চমকে উঠেছেন।

কী বলছ তুমি? আমি বলে উঠলাম, অসীম ঘৃণায় আমার চোখে জল এল।

প্রিন্স তোমার প্রশংসা করেছেন, তাই স্বামীর কথা, নারীসুলভ সম্ভ্রমের কথা ভুলে তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ছুটছ। এই আত্ম-সম্ভ্রমের অভাবে তোমার স্বামীর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, ইচ্ছে করেই তাকে ভুল বুঝছ তুমি। স্বামীকে আত্মত্যাগের কথা শোনাচ্ছ —যে আত্মত্যাগের উদাহরণ স্বরূপ তুমি বলতে চাও প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করা তোমার পক্ষে পরম সুখের বিষয়, কিন্তু সে সুখ তুমি ত্যাগ করছ।

কথা কইতে কইতে নিজের কণ্ঠস্বরেই তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন,

অত্যন্ত রূঢ়, অতি নিষ্ঠুর সে স্বর। এমন ব্যবহার, এমন মূর্তি তাঁর আগে কখনো দেখিনি, কখনো আশা করতে পারিনি এভাবে তাঁকে দেখব। বুকে রক্তের ঝলক বয়ে গেল, ভয় পেলাম। কিন্তু এও বুঝলাম যে এমন কিছু আমি করিনি যার জন্য আমি লজ্জা পেতে পারি; তাই আহত গর্বের উত্তেজনায় তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বললাম, এ আমি অনেকক্ষণ ধরেই আশা করছিলাম, বল, বলে যাও।

কী তুমি আশা করছিলে, জানিনা। কিন্তু দিনের পর দিন যেভাবে এই অর্থহীন সমাজের নোংরামি আর আলস্যবিলাসে তুমি মেতে উঠছিলে তাতে তোমার অবনতির চরম অবস্থা সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা হয়েছিল। সে আশঙ্কা এতদিনে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আজকের মত এত লজ্জা, এত ব্যথা 'আমি জীবনে কখনো পাইনি। তোমার বন্ধু কলুষিত তর্জনী-হেলনে আমার ঈর্ষ্যার কথা উচ্চারণ করে আমার অন্তরের অন্তস্তলে আঘাত করেছে।-আর সে ঈর্ষ্যা এমন একজনের প্রতি, যে তোমার বা আমার কারুরই চেনা নয়। অথচ তুমি আমাকে চিনতে বা বুঝতে চাইছ না,—বলছ, আমার জন্য তুমি আত্মত্যাগ করেছ। কিন্তু আত্মত্যাগ কাকে বলছ তুমি? তোমার এই অধঃপতন লক্ষ্য করে লজ্জায় মরে যাই আমি! আত্মত্যাগ!-কথাটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন তিনি।

হুঁ! সম্পূর্ণ নিরপরাধ স্ত্রীকে এভাবে অপমান করা, হেয় প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা স্বামীর আছে বৈকি! না, তোমার জন্য কোনো আত্মত্যাগ আমি করতে রাজি নই। শনিবারের এই পার্টিতে অবশ্যই আমি যাব। কথাগুলো বলতে বলতে আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল, নাসারন্ধ্রে এক অদ্ভুত স্ফীতিও সেই সঙ্গে অনুভব করলাম।

—এবং আশা করি তুমি তা উপভোগ করবে। কিন্তু আমাদের সম্পর্কের এই শেষ—অদম্য ক্রোধে ফেটে পড়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, কিন্তু আর তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিতে পারবে না। খুব ভুল করেছিলাম, যখন—এই পর্যন্ত বলে প্রাণপণে কথাটা এখানেই শেষ করলেন, ঠোঁট দুটো সামান্য কেঁপে উঠলো শুধু।

ভয় হল, ঘৃণায় আমার মন ভরে উঠল। ইচ্ছে হল বেশ দু কথা শুনিয়ে দিই, সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করি; কিন্তু মুখ খুললেই তখন আমি কান্নায় ভেঙে পড়তাম, নিজেকে খাটো করে ফেলতাম। একটিও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু তাঁর পাদচারণার শব্দ নাগালের বাইরে যেতেই আমি শিউরে উঠলাম—এ আমরা কী করেছি! ভয় হল, যে বন্ধন আমাদের এত সুখী করেছে চিরদিনের জন্য বুঝি তা ছিন্ন হয়ে গেল। ভাবলাম ফিরে যাই, কিন্তু তখনি ভেবে দেখলাম, আমার কথা বোঝবার মত ধৈর্য কি এর মধ্যেই তাঁর ফিরে এসেছে? নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে শুধু হাত বাড়িয়ে দিলেই কি তিনি আমার উদারতার সম্যক পরিচয় পাবেন? আমার দুঃখ-প্রকাশকে যদি কেবলমাত্র ছলনা বলেই মনে করেন? কিংবা এমনও তো হতে পারে যে, নিজের নির্দোষিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা বজায় রেখেও, নিজের গর্ব অক্ষুণ্ণ রেখেও তিনি আমার এ অনুতাপকে গ্রহণ করতে পারেন, আমাকে ক্ষমা করতে পারেন? কিন্তু কেন, আমার সমস্ত ভালবাসা সত্ত্বেও কেন তিনি এমন নিষ্ঠুরভাবে আমাকে অপমান করছেন?

তাঁর কাছে গেলাম না, ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে কাঁদলাম। আমাদের যে কথাবার্তা হয়েছিল তার প্রতিটি কথা মনে পড়তে থেকে

অত্যন্ত রূঢ়, অতি নিষ্ঠুর সে স্বর। এমন ব্যবহার, এমন মূর্তি তাঁর আগে কখনো দেখিনি, কখনো আশা করতে পারিনি এভাবে তাঁকে দেখব। বুকে রক্তের ঝলক বয়ে গেল, ভয় পেলাম। কিন্তু এও বুঝলাম যে এমন কিছু আমি করিনি যার জন্য আমি লজ্জা পেতে পারি; তাই আহত গর্বের উত্তেজনায় তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বললাম, এ আমি অনেকক্ষণ ধরেই আশা করছিলাম, বল, বলে যাও।

কী তুমি আশা করছিলে, জানিনা। কিন্তু দিনের পর দিন যেভাবে এই অর্থহীন সমাজের নোংরামি আর আলস্যবিলাসে তুমি মেতে উঠছিলে তাতে তোমার অবনতির চরম অবস্থা সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা হয়েছিল। সে আশঙ্কা এতদিনে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আজকের মত এত লজ্জা, এত ব্যথা আমি জীবনে কখনো পাইনি। তোমার বন্ধ কলুষিত তর্জনী-হেলনে আমার ঈর্ষ্যার কথা উচ্চারণ করে আমার অন্তরের অন্তস্তলে আঘাত করেছে। – আর সে ঈর্ষ্যা এমন একজনের প্রতি, যে তোমার বা আমার কারুরই চেনা নয়। অথচ তুমি আমাকে চিনতে বা বুঝতে চাইছ না,—বলছ, আমার জন্য তুমি আত্মত্যাগ করেছ। কিন্তু আত্মত্যাগ কাকে বলছ তুমি? তোমার এই অধঃপতন লক্ষ্য করে লজ্জায় মরে যাই আমি! আত্মত্যাগ! – কথাটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন তিনি।

হুঁ! সম্পূর্ণ নিরপরাধ স্ত্রীকে এভাবে অপমান করা, হেয় প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা স্বামীর আছে বৈকি! না, তোমার জন্য কোনো আত্মত্যাগ আমি করতে রাজি নই। শনিবারের এই পার্টিতে অবশ্যই আমি যাব। কথাগুলো বলতে বলতে আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল, নাসারন্ধ্রে এক অদ্ভুত স্ফীতিও সেই সঙ্গে অনুভব করলাম।

—এবং আশা করি তুমি তা উপভোগ করবে। কিন্তু আমাদের সম্পর্কের এই শেষ—অদম্য ক্রোধে ফেটে পড়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, কিন্তু আর তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিতে পারবে না। খুব ভুল করেছিলাম, যখন—এই পর্যন্ত বলে প্রাণপণে কথাটা এখানেই শেষ করলেন, ঠোঁট দুটো সামান্য কেঁপে উঠলো শুধু।

ভয় হল, ঘৃণায় আমার মন ভরে উঠল। ইচ্ছে হল বেশ দু কথা শুনিয়ে দিই, সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করি; কিন্তু মুখ খুললেই তখন আমি কান্নায় ভেঙে পড়তাম, নিজেকে খাটো করে ফেলতাম। একটিও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু তাঁর পাদচারণার শব্দ নাগালের বাইরে যেতেই আমি শিউরে উঠলাম—এ আমরা কী করেছি! ভয় হল, যে বন্ধন আমাদের এত সুখী করেছে চিরদিনের জন্য বুঝি তা ছিন্ন হয়ে গেল। ভাবলাম ফিরে যাই, কিন্তু তখনি ভেবে দেখলাম, আমার কথা বোঝবার মত ধৈর্য কি এর মধ্যেই তাঁর ফিরে এসেছে? নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে শুধু হাত বাড়িয়ে দিলেই কি তিনি আমার উদারতার সম্যক পরিচয় পাবেন? আমার দুঃখ-প্রকাশকে যদি কেবলমাত্র ছলনা বলেই মনে করেন? কিংবা এমনও তো হতে পারে যে, নিজের নির্দোষিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা বজায় রেখেও, নিজের গর্ব অক্ষুণ্ণ রেখেও তিনি আমার এ অনুতাপকে গ্রহণ করতে পারেন, আমাকে ক্ষমা করতে পারেন? কিন্তু কেন, আমার সমস্ত ভালবাসা সত্ত্বেও কেন তিনি এমন নিষ্ঠুরভাবে আমাকে অপমান করছেন?

তাঁর কাছে গেলাম না, ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে কাঁদলাম। আমাদের যে কথাবার্তা হয়েছিল তার প্রতিটি কথা মনে পড়তে থেকে

থেকে শিউরে উঠলাম। সে কথাবার্তার বদলে অন্য কথা, মিষ্টি কথা বসালাম, নতুন কথা যোগ করলাম। কিছুক্ষণ চিন্তা করতেই বাস্তবের সমস্ত অনুভূতি আবার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, আতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে আঘাতের বোধটাও মনে জাগল। সন্ধ্যাবেলা চায়ের সময় স্বামীর সঙ্গে দেখা হল। এক বন্ধু আমাদের বাড়িতে ছিলেন, তিনি উপস্থিত ছিলেন; স্বামীও ছিলেন। মনে হল, এক বিরাট ব্যবধান যেন আমাদের দুজনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কবে যাব। আমি কিছু বলবার আগেই স্বামী বললেন, মঙ্গলবার। কাউণ্টেসের পার্টির জন্য আমাদের থেকে যেতে হবে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি পার্টিতে যেতেই চাও তো?

ভয় পেলাম ওঁর এই সাধারণ ভাবে কথা বলার ভঙ্গিতে, সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকালাম। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি,—নিষ্ঠুর, ঘৃণা-মাখানো সে দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর শীতল, স্থির।

উত্তরে আমি বললাম, হ্যাঁ।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা দুজন যখন একা-একা, কাছে এসে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, আজ যা বলেছি ভুলে যাও, লক্ষ্মীটি।

তাঁর হাতে হাত দিতে একটা ছোট্ট হাসি আমার ঠোঁটে কেঁপে উঠল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি দূরের একটা ইজিচেয়ারে গিয়ে বসলেন, পাছে উচ্ছ্বাসপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এই ভয়েই হয়ত। ভাবলাম, এখনো কি তিনি মনে করেন তিনি যা করছেন তাই ঠিক? সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে, পার্টিতে যেতে চাই না একথা তাঁকে জানাতে

কোনো আপত্তি না থাকা সত্ত্বেও কথাগুলো আমার ঠোঁটেই মরে গেল, বলা হল না।

উনি বললেন, আমাদের যাওয়া যে পেছিয়ে গেছে একথা মাকে লিখে জানাতে হবে, নইলে মা অস্বস্তি বোধ করবেন।

কবে যাবে ঠিক করছ ?

মঙ্গলবার, পার্টির পরে।

আশা করি এ নতুন ব্যবস্থা আমার জন্য নয়, তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে কোনো ভাষা প্রকাশ পেল না, কি একটা আবরণ যেন তাঁর দৃষ্টিকে আমার চোখ থেকে আড়াল করে রেখেছে। তাঁর মুখ যেন হঠাৎ অনেক বার্ধক্যগ্রস্ত, নিতান্ত কুশ্রী হয়ে উঠেছে।

আমরা পার্টিতে গেলাম, মনে হল আমাদের মধ্যে আবার বন্ধুভাব ফিরে এসেছে। কিন্তু এ বন্ধুভাবের সঙ্গে আমাদের পুরোনো বন্ধুত্বের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

কয়েকজন মহিলার সঙ্গে বসে গল্প করছি, এমন সময় প্রিন্স আমার কাছে এলেন, ফলে তাঁর সঙ্গে কথা কইবার জন্য আমাকে দাঁড়িয়ে উঠতে হল। উঠে দাঁড়াতেই আমার দৃষ্টি আপনা হতেই স্বামীর ওপরে পড়ল,— ঘরের অপর প্রান্ত থেকে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এখন চোখ ফিরিয়ে নিলেন। লজ্জা ও ব্যথার এক তীব্র অনুভূতি হঠাৎ আমাকে আশ্রয় করল। সমস্তই কেমন গোলমাল হয়ে গেল, প্রিন্সের দৃষ্টির সামনে আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না, আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। বাধ্য হয়েই আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম, লম্বা

লোকটির কথা আমার কানে আসতে লাগল। আমাদের কথা শেষ হল। আমার আসন ওঁর পাশে নির্দিষ্ট ছিল না, তিনিও নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে তাঁর সান্নিধ্যে আমার অস্বস্তি লাগছে। আগেকার নাচের আলোচনা হল, আগামী গ্রীষ্মটা আমি কোথায় কাটাব জানালাম; আরো দুয়েকটা কথা হল। বিদায়ের আগে তিনি স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। ঘরের দূর কোণে ওঁরা কথা কইতে লাগলেন। প্রিন্স নিশ্চয় আমার সম্বন্ধেই কিছু বলছিলেন, কারণ কথার মধ্যে একটু হেসে তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন।

হঠাৎ স্বামীর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, প্রিন্সকে বাও করে বিদায়ের অপেক্ষা না রেখেই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। আমিও রাঙা হয়ে উঠলাম; আমার সম্বন্ধে, বিশেষ করে আমার স্বামী সম্বন্ধে প্রিন্সের কী ধারণা হল, লজ্জা পেলাম সেকথা ভেবে। আমার অপ্রতিভ ভাব, আর স্বামীর অস্বাভাবিক ব্যবহার হয়ত সকলেই লক্ষ্য করেছে। হা ভগবান, এর কী অর্থ তারা করছে! স্বামীর সঙ্গে আমার যে ব্যাপার ঘটে গেছে তা কি জানাজানি হয়ে গেল নাকি?

প্রিন্সেস ডি-র গাড়িতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে স্বামীর কথা তাঁকে বললাম। ধৈর্যের শেষ সীমানায় এসে পড়েছিলাম, এই পার্টির ব্যাপার নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে, সবিস্তারে তাঁকে তা জানালাম। আমাকে শান্ত করবার জন্য তিনি বললেন যে এমন মনোমালিন্য খুব সাধারণ ব্যাপার এবং এতে কোনো গুরুত্ব দিতে নেই। বললেন, এ ঝগড়ার কথা পরে আর মনেই থাকবে না। আমার স্বামী সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা তাও শুনলাম,—তিনি নাকি অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে রয়েছেন, কারুর সঙ্গে মিশছেন না। আমিও প্রিন্সেসের সঙ্গে

একমত হলাম, মনে হল আমিও যেন স্বামীকে আগের চেয়ে আরো খুঁটিয়ে, আরো নিভুর্লে বিচার করতে পারছি।

এর পরে কিন্তু যখন স্বামীর সঙ্গে নিভৃতে মিলিত হয়েছি, এই যে আমি এভাবে ওঁর বিচারের ভার নিজের হাতে নিয়েছি এ চিন্তা এক গুরুভার অপরাধের মত হয়ে আমার বিবেকের ওপর চেপে বসেছে, আমাদের দুজনের মধ্যেকার ব্যবধানও যেন আরো বিস্তার লাভ করেছে।

সেই থেকে আমাদের জীবনে, আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। আজকাল আর আগের মত দুজনে একত্র হলে তেমন খুসীতে ভরপুর হয়ে উঠিনা। কয়েকটা বিষয়ে অবশ্য আমরা কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি এবং লক্ষ্য করেছি, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমাদের কথাবার্তা আরো সহজ, আরো স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। যদিবা কখনো গ্রাম্য জীবনের কথা, অথবা কোনো নাচের কথা উঠত, আমরা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতাম, পরস্পরের দৃষ্টি এড়াতে চেষ্টা করতাম। দুজনের মধ্যে এই যে ব্যবধান, এর কারণ আমাদের অজানা ছিল না, এবং সে কথা তুলতে আমরা সাহস করতাম না। গর্বিত আর একগুঁয়ে বলে তাঁকে আমি নিশ্চিত চিনেছিলাম, তাই আমি সাবধান হয়ে গেলাম, যাতে না তাঁর দুর্বল স্থানে আঘাত করে বসি। তাঁরও স্থির ধারণা হয়েছিল যে গ্রাম্য জীবন আমার পছন্দ নয় এবং সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে মেশবার জন্য আমি ছটফট করি,— এবং আমার এই রুচিকে যে তাঁকে মেনে চলতে হবে, এও তিনি জানতেন। যে কোনো বিষয়েই আমরা স্পষ্ট আলোচনাকে এড়িয়ে

চলতে লাগলাম, এবং ফলে দুজনেই দুজনকে ভুল বুঝলাম। আজকাল আর আমরা পরস্পরকে পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় বলে মনে করি না। পরস্পরকে মনে মনে বিচার করে আসছি, তৃতীয় ব্যক্তির মত পরস্পরের অপরাধের হিসেব নিচ্ছি। পিটার্সবার্গ যাবার আগে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা সহরের কাছাকাছি একটা বাড়িতে উঠে গেলাম। আমাকে সেখানে রেখে উনি নিকল্স্কোয় মায়ের কাছে গেলেন। ততদিনে অবশ্য আমি সেরে উঠেছি, সঙ্গে যেতে পারতাম; কিন্তু তিনি আমাকে স্বাস্থ্যের অজুহাতে সেখানেই থেকে যেতে বললেন। অবশ্য আমি বুঝেছিলাম যে গ্রামে গেলে আমরা অসুখী হব এই ভয়েই তিনি এই ব্যবস্থা করেছেন। আমিও বিশেষ আপত্তি না করায় তিনি একাই গেলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমার অত্যন্ত একা-একা বোধ হচ্ছিল বটে, কিন্তু তিনি ফিরে আসতেও আমার এই নিঃসঙ্গ ভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। আমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেকটি অনুভূতির কথা তাঁকে না জানানো পর্যন্ত মনে হত যেন মহা অপরাধ করছি। তাঁর প্রত্যেক কাজে, প্রতিটি কথার মধ্যে এক পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যেত,—এমন দিন গেছে যখন দেখা হতেই আমরা আনন্দে ভরপুর হতাম। কিন্তু সে সম্বন্ধ আর আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের অলক্ষ্যে, এমনভাবে এ পরিবর্তন এসেছে যে আমরা তা অনুভব করতে পারিনি। পৃথক চিন্তা, পৃথক স্বার্থও আজকাল মাথা তুলতে শুরু করেছে। এই যে আমাদের মধ্যে একটা আবরণ এসে পড়েছে, এ চিন্তা পর্যন্ত আর আমাদের বিব্রত করে না, এও ক্রমে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, এক বছর যেতে-না-যেতেই আমরা পরস্পরকে সহজভাবে নিতে পারছি। যে

শিশু-সুলভ আনন্দ-উচ্ছ্বাস আমার সান্নিধ্যে এলেই তাঁর মধ্যে দেখা দিত, তাও কোথায় দূর হয়েছে। সমস্ত কিছুর ওপর তাঁর শান্ত অবহেলা আমাকে আগে পীড়ন করত, কিন্তু তাও আর তাঁর মধ্যে আজকাল দেখা যাচ্ছে না। তাঁর যে তীক্ষ্ম দৃষ্টি আমাকে বিব্রত করত, আনন্দ দান করত সে দৃষ্টি আর তাঁর নেই, উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে অধীর হয়ে ওঠা, একসঙ্গে বসে প্রার্থনা করা, সে সবেরও শেষ হয়েছে। দেখা-শুনোও আমাদের খুব বেশী হত না, প্রায়ই তিনি বাইরে বাইরেই কাটাতেন। আমাকে যে নিঃসঙ্গ বাড়িতে বসে থাকতে হচ্ছে এ চিন্তাও তাঁকে পীড়ন করত না। আর আমিও ঘন ঘন অভিজাত মহলে বিচরণ করতাম, সেখানে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না।

এর পর আর আমাদর মধ্যে কোনরকম ঝগড়াঝাটি হয় নি। আমি ওঁকে তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করতাম, আর উনিও আমায় কোনো অভাব রাখতেন না। অপর ব্যক্তি কেউ দেখলে হয়ত মনে করত যে আমাদের প্রেম অক্ষুণ্ণই রয়েছে পূর্ববৎ।

যখন আমরা দুজন নিরালায় থাকতাম,—এমন অবস্থা ঘটত খুব কমই—ওঁর উপস্থিতিতে আনন্দ বা উত্তেজনা বা অস্বস্তি কিছুই অনুভব করতাম না,—মনে হত যেন একা-একাই রয়েছি। উনি যে অপরিচিত কেউ নন, স্বামী, আমার একান্ত আত্মীয়,—এ বোধ অবশ্য তখনো আমার হত এবং এও জানতাম তিনি কী বলবেন বা কী করবেন। যদিবা কখনো তাঁর কোনো ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছি তো বুঝব যে তিনি ভুল করেছেন। কোন কিছুর প্রত্যাশাও আমি তাঁর কাছে থেকে করিনা। এক কথায় বলতে গেলে, তিনি শুধু আমার স্বামী, তা ছাড়া আর কিছু নন। মনে হত, এইভাবেই আমাদের দিন চলে যাবে, আমাদের

দুজনের মধ্যেও যেন এ ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ কোনকালে ছিল না। তিনি বাইরে গেলে প্রথম প্রথম আমার অত্যন্ত একা-একা বোধ হত, ভয় হত; কারো ওপর নির্ভর করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতাম। আর তিনি ফিরে এলে সানন্দে তাঁর দু'বাহুর মধ্যে আশ্রয় নিতাম। কিন্তু দুঘণ্টা যেতে না যেতেই সে আনন্দ কোথায় দূর হয়ে যেত; তাঁকে বলবার মত কোনো কথাই খুঁজে পেতাম না। মাঝে মাঝে কচিৎ কখনো যদিবা স্নেহের ধারা আমাদের মধ্যে বয়ে গেছে, কী একটা ব্যথা, কী একটা অস্বস্তি যেন মনের মধ্যে অনুভব করেছি, —এই অনুভূতির প্রতিচ্ছবি তাঁরও চোখে ফুটে উঠেছে। আমাদের মধ্যে ভালবাসার যে একটা বাঁধাধরা সীমারেখা রয়েছে, তিনি তা অতিক্রম করতে চান না, আমার অবস্থাও তাই। এতে আমার মাঝেমাঝে কষ্ট হত, কিন্তু কোনো বিষয় নিয়ে একাগ্র চিন্তা করবার মত অবস্থা তখন আমার ছিল না। এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি না পাওয়ার যে দুঃখ, তা আমি ভুলতে চেষ্টা করতাম আমার নাগালের মধ্যে যে আকর্ষণ ছিল তার মধ্যে ডুবে থেকে। ফ্যাসনের যে চাকচিক্য প্রথম প্রথম আমার চোখ ঝলসে যেত, আত্মপ্রীতির চেতনায় আমি আত্মহারা হয়ে উঠতাম, সেই ফ্যাসনের নেশাই এখন সম্পূর্ণভাবে আমার ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করল, আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সেই অভ্যাসের কাছে আমি দাসখৎ লিখে দিলাম, আমার চিন্তাশক্তিকে পর্যন্ত তা আচ্ছন্ন করে ফেলল।

আমি নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারিনা, নিজের সম্বন্ধে পূর্বাপর চিন্তা করতেও আমার ভয় হয়। সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত আমার আভিজাত্যের দাবী মেটাতেই কেটে যায়—বাড়ি থেকে না বেরোলেও

এর কোনো ব্যতিক্রম হয় না। এভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা—এ আর আমার ভাল বা মন্দ কিছুই মনে হয় না। বরং মনে হয় যেন ঠিক এভাবেই এতদিন আমার জীবন চলে এসেছে এবং এভাবেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি লাভ করবে।

এইভাবে কেটে গেল তিন বছর। আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের কোনো পরিবর্তন এর মধ্যে হয়নি,—ঠিক যেন এমন এক অবস্থায় আমরা এসে পড়েছি যার আর কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে অবশ্য দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমার জীবনে ঘটে গেছে—এক, আমার প্রথম পুত্রের জন্ম, আর দুই, আমার শাশুড়ির মৃত্যু। প্রথম কিছুদিন মাতৃত্ব আমার মধ্যে এমন প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল, অচিন্ত্যপূর্ব এমন এক আনন্দের শিহরণ আমার মধ্যে এনে দিয়েছিল যে, আশা করেছিলাম এই উপলক্ষ্য করেই আমার জীবনে নতুন ধারার সূত্রপাত হবে। কিন্তু দুমাস যেতে-না-যেতেই আবার যখন সমাজে মিশতে শুরু করলাম, এ অনুভূতি ক্রমেই হালকা হতে হতে শেষ পর্যন্ত কেবল এক নীরস অভ্যাসেই পরিণত হল। স্বামী কিন্তু এই পুত্রের জন্মের পর থেকেই আবার আগের মত হয়ে গেলেন,—তেমনি ধীর স্থির, সংসারের ওপর মায়াও তাঁর অনেক বর্ধিত হল। জীবনের যত মাধুর্য যত আনন্দোচ্ছ্বাস, সব তিনি এই শিশুর ওপর ঢেলে দিলেন। অনেক রাত্রে নাচের আসরে যাবার সময় আমি শিশুর ঘরে যেতাম, ঘুমোবার আগে তার বুকে ক্রসের চিহ্ন এঁকে দিতাম। সেখানে কতদিন স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। যে ভর্ৎসনার ভাষা সে সময়ে তাঁর চোখে প্রকাশ পেয়েছে তা অনুভব করে লজ্জা পেয়েছি। শিশু-পুত্রের প্রতি নিজের উদাসীনতার কথা চিন্তা করে মন ব্যথায় ভরে

গিয়েছে। প্রশ্ন করেছি নিজেকে, অন্যান্য নারীর তুলনায় সত্যই কি আমি হীন? কিন্তু ভেবে দেখেছি, এর কোনো প্রতীকার নেই। নিজের মনেই বললাম, ছেলেকে আমি যতই ভালবাসি না কেন, সব সময় তার কাছে বসে থাকা অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং এ বিষয়ে কোনো মিথ্যা অভিনয়কে আমি প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নই।

মায়ের মৃত্যুতে স্বামী অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েছিলেন, বললেন, মাকে হারিয়ে নিকল্‌স্কোতে বাস করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠছে। আমার ব্যাপার কিন্তু আলাদা। শাশুড়ির মৃত্যুতে অবশ্য আমারও দুঃখ হয়েছিল এবং স্বামীকে তাঁর শোকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, কিন্তু তবুও শাশুড়ির মৃত্যুর পরই বরং বাড়িতে বাস করা আমার পক্ষে সহজ এবং সুখকর হয়ে উঠেছিল। এই তিন বছরের অধিকাংশই আমাদের সহরে কেটেছে; শুধু দু'মাস অন্তর একবার করে নিকল্‌স্কোয় গিয়েছিলাম। তৃতীয় বছর আমরা বিদেশে গিয়েছিলাম, গ্রীষ্মটা কেটেছিল ব্যাডেনে।

আমার বয়স তখন একুশ। আমার যতদূর ধারণা, আমাদের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। গার্হস্থ্য জীবনের কাছে আমার কোনো অভাব অভিযোগ নেই। পরিচিত সকলের কাছেই আমি ভালবাসা পেয়ে এসেছি। আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং ব্যাডেনের মহিলা-মহলে আমি ছিলাম সব চেয়ে সুসজ্জিত, জানতাম আমার রূপেরও অভাব নেই। সুন্দর আবহাওয়ায় সু-রূপ আর সুরুচির মধ্যে বাস করতাম, এক কথায়, বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল। নিকল্‌স্কোয় যখন থাকতাম তখন হয়ত আরো আনন্দ পেয়েছি। আমার সুখ তখন আমার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, মনে হত, এ সুখে আমার কায়েমি

অধিকার এবং আশা ছিল, ভবিষ্যতে আমার এ সুখ আরো বর্ধিত হবে। তখন অবশ্য অবস্থা ছিল ভিন্ন। কিন্তু এ গ্রীষ্মও আমার বেশ ভাল ভাবেই কাটল। কোনো বিশেষ বাসনা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগে না, এই জীবনকেই পরিপূর্ণ জীবন বলে মনে হয়; বিবেকের দংশনও অনুভব করি না। ব্যাডেনের সমাজে এমন একজনও ছিল না যার প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল, এমন কি, আমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের পূর্ব-পরিচিত প্রিন্স কে-র প্রতি পর্যন্ত নয়। তাদের কেউ হয়ত অল্পবয়স্ক, কেউ বৃদ্ধ, কেউ সুদর্শন; কেউ ফরাসী, কেউ বা দাড়ি রাখেন, কেউ রাখেন না। এরা সবাই আমার চোখে এক, কিন্তু এদের যে-কোনো একজনকে না হলেই আমার চলে না। কারো মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এরা সবাই মিলে যে পরিবেশের সৃষ্টি করত, আমার অত্যন্ত প্রিয় সে পরিবেশ। কিন্তু একজন ইতালীয় মার্কুইস ওদের মধ্যে ছিলেন। যে দুঃসাহসের সঙ্গে তিনি আমার স্তাবকতা করতেন তার মধ্যে অসাধারণত্ব ছিল। আমার সঙ্গে একত্র হবার প্রতিটি সুযোগ তিনি গ্রহণ করতেন,—আমার সঙ্গে নাচতেন, ঘোড়ায় চড়তেন, ক্যাসিনোতে দেখা করতেন। যেখানেই যেতেন আমার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতেন। জানলা দিয়ে অনেকবার তাঁকে আমার হোটেলের সামনে পায়চারি করতে দেখেছি। তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করেছি, লজ্জায় আমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। ভদ্রলোক অল্পবয়স্ক, সুপুরুষ, ব্যবহার ভদ্র। শুধু তাই নয়, তাঁর হাসি, তাঁর ভ্রূ-ভঙ্গি অনেকটা আমার স্বামীর মতই,—যদিও অবশ্য স্বামী তাঁর চেয়ে অনেক সুন্দর। ওঁদের এই সাদৃশ্যে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম

কাছে, কিন্তু মার্কুইসের ঠোঁট, চোখের দৃষ্টি, চিবুক, সমস্ত কিছুর মধ্যেই যে রুক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার তুলনায় স্বামীর নম্র-মধুর, উদার গম্ভীর ব্যবহারের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। আমার বিশ্বাস মার্কুইস আমার প্রেমে মশগুল হয়ে রয়েছেন, কিন্তু কতকটা কৃপাপরবশ হয়েই আমি তাঁর কথা চিন্তা করতাম। মাঝে মাঝে কখনো-সখনো যখনই তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছি, তাঁর মধ্যে বন্ধুসুলভ সহজ ভাব আনবার চেষ্টা করেছি, তিনি প্রবল আপত্তি তুলেছেন, প্রায় আত্মসংযম হারিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছেন। কথাটা নিজের কাছে স্বীকার করতে না চাইলেও আমি বলতে বাধ্য যে আমি তাঁকে ভয় করতাম, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর কথা চিন্তা করতাম। স্বামী তাঁকে চিনতেন। আমাদের পরিচিত যেসব ব্যক্তির কাছে তাঁর পরিচয় শুধু আমার স্বামী হিসেবেই ছিল, তাদের প্রতি তাঁর যে ঘৃণা যে অবজ্ঞা ছিল, তাঁর প্রতি তা ছিল আরো অনেক বেশী।

গ্রীষ্মের শেষের দিকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, ফলে এক পক্ষ-কাল আমাকে বাড়িতেই আটকে থাকতে হয়েছিল। এরপর প্রথম যেদিন বেরোই সেদিন একটা ব্যাণ্ড পার্টি ছিল। শুনলাম এক বিখ্যাত ইংরেজ রূপসী, লেডি এস্, অনেক দিনের প্রতীক্ষার পর আমার অসুখের সময়ে এখানে এসেছেন। আশে-পাশের সকলের মুখেই তাঁর কথা, তাঁর রূপের সুখ্যাতি। দেখলাম তাঁকে। সুন্দরী সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর মধ্যে আত্মতৃপ্তির যে ভাব লক্ষ্য করলাম, তা অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হল এবং এ কথা আমি প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হইনি। এতদিন আমি যেসব বিষয়ে আনন্দ পেয়ে এসেছি, সে সমস্তই আমার সেদিন অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হল।

পরদিন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাবার জন্য লেডি এস্ একটা দল তৈরি করলেন, কিন্তু আমি যেতে চাইলাম না। আমি ছাড়া প্রায় সকলেই কিন্তু লেডি এস্-এর দলে যোগ দিল, এবং এই ব্যাপারের ফলে ব্যাডেন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল তার পরিবর্তন হল। সমস্ত কিছু, এমন কি প্রত্যেকটি মানুষকে সম্পূর্ণ অর্থহীন, পরম বিরক্তিকর মনে হল। ইচ্ছে হল কাঁদি, তাড়াতাড়ি সেরে উঠে রাশিয়ায় ফিরে যাই। কয়েকটা কু-মতলব আমার মনে জেগে উঠেছিল, কিন্তু আমি তাদের স্বীকার করে নিই নি। শারীরিক দুর্বলতার অজুহাতে আমি পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করলাম, আর যদিও বা কখনো কোথাও গেছি তাও সকালের দিকে, আর গিয়ে কেবল দু-এক গ্লাস জল পান করেছি। আমার একমাত্র সঙ্গী হতেন এক রাশিয়ান মহিলা, মাদাম্ এম্। তাঁর সঙ্গে কখনো বা আশেপাশে কোথাও গাড়ি করে বেরোতাম। স্বামী ছিলেন না, কয়েক দিনের জন্য হিডেলবার্গে গিয়েছিলেন। ঠিক করেছিলেন, আমি সেরে উঠলে রাশিয়ায় ফিরবেন। মাঝে মাঝে তিনি ব্যাডেনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতেন।

একদিন লেডি এস্ সমস্ত দলবল নিয়ে শিকারে গিয়েছেন, মাদাম এম্ আর আমি বিকেলের দিকে গাড়ি নিয়ে দুর্গ দেখতে গেলাম। প্রাচীন চেস্টনাট গাছগুলোর পাশ দিয়ে, অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত আঁকাবাঁকা পথে আমাদের গাড়ি ধীরে ধীরে চলেছে। আমাদের কথাবার্তার হালকা সুর আর রইল না, বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এত দিনের পুরোনো এ বন্ধু আজ এক নতুন আলোয় দেখা দিলেন, বুদ্ধিমতী, হিতৈষী বলেই তাঁকে মনে হল,—এমনটি, সমস্ত কথাই যাঁর কাছে খুলে বলা চলে, যার বন্ধুত্ব সত্যই একান্ত কাম্য। ঘরোয়া সুখ-

দুঃখের কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, ব্যাডেনের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা আলোচনা করতে করতে হঠাৎ কখন রাশিয়ার জনপদ আমাদের একান্ত প্রিয় হয়ে উঠল। দুর্গে প্রবেশের পরেও আমাদের এ মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। দুর্গের অভ্যন্তর ছায়াবহুল, স্নিগ্ধ ; সূর্যের আলো ওপর থেকে ধ্বংসাবশেষের ওপরে এসে পড়েছে। পায়ের শব্দ আর কথা বলবার শব্দ আমাদের কানে আসছে। এই রমণীয় দৃশ্য (রাশিয়ানের কাছে যতই নীরস হোক না কেন) সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথ দিয়ে আমাদের সামনে প্রকাশ লাভ করছে। বিশ্রামের জন্য বসলাম, নীরবে লক্ষ্য করলাম সূর্যাস্ত। ওদের কথাবার্তা ক্রমে উচ্চতর হল, মনে হল কে যেন আমার নাম উচ্চারণ করল। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম, প্রতিটি কথা শোনবার ইচ্ছা দমন করতে পারলাম না। চেনা কণ্ঠস্বর, কথা কইছেন ইতালীয় মার্কুইস আর তাঁর ফরাসী বন্ধু। তিনিও আমার চেনা। আমার আর লেডি এস্-এর সম্বন্ধে ওঁদের কথা হচ্ছিল। ফরাসী ভদ্রলোক আমাদের রূপের তুলনা করছিলেন। অসম্মানজনক কিছু না বললেও ভদ্রলোকের কথায় আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল। দুজনের সৌন্দর্যের তুলনামূলক বিস্তারিত বর্ণনা তিনি করলেন। বললেন, আমার সন্তান হয়েছে, আর লেডি এস্-এর বয়স মাত্র উনিশ ; আমার চুল ভাল, লেডি এস্-এর গড়ন ভাল। আর তা ছাড়া, লেডি এস্ চমৎকার মহিলা, কিন্তু আমার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই যা লক্ষ্য করার মত,—যে-সব অসংখ্য রাশিয়ান ধনী আজকাল এখানে বেড়াতে আসেন তাদেরই একজন ছাড়া আর কিছু আমি নই। এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন যে লেডি এস্-এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে আমি বুদ্ধির কাজই করেছি এবং তাঁর মতে

ব্যাডেনের অভিজাত সমাজের চোখে আমার সম্পূর্ণ সমাধি হয়েছে।

ওঁর জন্য সত্যি দুঃখ হয় আমার—অবশ্য এক যদি আপনার সঙ্গে মিশে উনি একটু শান্তনা পেতে পারেন! বলতে বলতে ভদ্রলোক কঠিন হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর বললেন, উনি যদি চলে যান তো ওঁর অনুসরণ করে আমি—বাকীটা ইতালীয় ভাষায় কা বললেন বোঝা গেল না।

খাসা আছেন ভদ্রলোক, এখনো প্রেমের মোহ কাটেনি! হাসতে হাসতে ফরাসী ভদ্রলোক বললেন।

প্রেম! অপর পক্ষের কণ্ঠ শোনা গেল, তারপর কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর বললেন, প্রেম আমার একান্ত প্রয়োজন, এ ছাড়া আমার চলে না। জীবনটাকে নভেলে পরিণত করাই তো মানুষের একমাত্র কাজের মত কাজ! আমার নভেলে মাঝপথে ভেঙে পড়ার ব্যাপার কিছু নেই, এ ক্ষেত্রেও আমি একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখব।

আশা করি বন্ধু, আপনার এ বাসনা পূর্ণ হবে, অপর ভদ্রলোক ফরাসী ভাষায় বললেন।

এবার ওঁরা এক মোড় ফিরলেন, ওঁদের কথাবার্তা বন্ধ হল। ওঁদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার শব্দ পেলাম, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা পাশের দরজা দিয়ে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে এলেন। আমাদের দেখে ওঁরা খুব আশ্চর্য হলেন, আর মার্কুইসকে আমার দিকে এগোতে দেখে আমি লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলাম, ভয় পেলাম, দুর্গ থেকে বেরোবার সময় যখন তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি না বলতে পারলাম না। মাদাম এম্ আর

এই ভদ্রলোকের বন্ধুর পেছন পেছন গাড়ির দিকে এগোলাম। ফরাসী ভদ্রলোকের মন্তব্যে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। আমার কাছে অবশ্য আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আমার নিজেরই মনের ভাবকে তিনি কথায় প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ইতালীয় ভদ্রলোক খোলাখুলি ভাবে যেসব মন্তব্য করেছিলেন তার রূঢ়তায় আমি যেমন আশ্চর্য হয়েছিলাম, আহতও হয়েছিলাম তেমনি। আরো বিরক্ত লাগল একথা ভেবে যে আমি তাঁর সমস্ত কথা শুনতে পেয়েছি জেনেও ভদ্রলোক একটুও অপ্রস্তুত হচ্ছেন না। উনি এত কাছে আসায় আমার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হচ্ছিল, তাই দ্রুত পা ফেলে আমি অপর সঙ্গীদুজনের সঙ্গে এগিয়ে চললাম, তাঁর দিকে তাকালাম না বা তাঁর কথার উত্তরও করলাম না, আর দূর থেকে এমন ভাবে তাঁর হাত ধরে রইলাম যাতে তাঁর কথা আমার কানে না আসে। সুন্দর দৃশ্যের কথা, হঠাৎ আমাদের দেখা পেয়ে তাঁর যে আনন্দ হল সে কথা, এমনি আরো কত কি তিনি বলেছিলেন, কিন্তু আমি সেদিকে কান দিই নি। আমার মন তখন আমার স্বামী, আমার সন্তান, আমার দেশের চিন্তায় ভরপুর। লজ্জা পেলাম, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হল। হোটেলে ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম—মনের মধ্যে এই যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, স্থিরভাবে সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। মাদাম এম্ কিন্তু ধীরে ধীরে চলেছেন, যদিও গাড়িটা সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। যাঁর হাত ধরে চলেছি, মনে হল তিনি যেন ইচ্ছে করেই ধীরে ধীরে চলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্যই যেন আমাকে ওখানে আটকে রাখা। মনে ভাবলাম, ওসব আর চলছে না। মন স্থির করে আমি জোরে জোরে পা চালালাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আর আমার বুঝতে বাকি

রইল না যে সত্যিই তিনি আমাকে আটকে রাখতে চেষ্টা করছেন, এমন কি, আমার হাতে চাপ দিতে পর্যন্ত তিনি দ্বিধা করলেন না। মাদাম এম্ একটা মোড় ফিরতেই আর আমাদের সঙ্গে কেউ রইল না। আমার ভয় হল।

মাফ করবেন, নীরস কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম। চেষ্টা করলাম তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিতে, কিন্তু আমার জামার হাতার সঙ্গে তাঁর কোটের একটা বোতাম আটকে গেল। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি বোতামটা খুলতে চেষ্টা করলেন, তাঁর খালি হাতের আঙুল আমার হাত স্পর্শ করল। কতকটা ভয় আর কতকটা সুখে মেশানো সম্পূর্ণ অজানা এক অনুভূতি আমার মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে বরফের স্রোত বইয়ে দিল। ওঁর দিকে তাকালাম, ইচ্ছে হল আমার অন্তরের সমস্ত ঘৃণা সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠুক। কিন্তু সে দৃষ্টিতে কেবল আতঙ্ক আর উত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পেল না। অদ্ভুত তরল দৃষ্টিতে তিনি আমার মুখে তাকালেন, তাঁর একাগ্র দৃষ্টি আমার ঘাড়ে, আমার বুকে বুলিয়ে যাচ্ছে। আমার কব্জির ওপরটা তিনি দুহাতে চেপে ধরলেন, দু'ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শোনা গেল, তিনি আমাকে ভালবাসেন, আমি ছাড়া এজগতে তাঁর আর কেউ নেই, কিছু নেই। তার ঠোঁটদুটো ক্রমেই এগিয়ে আসছে, হাত ক্রমেই আমার হাতের ওপরে শক্ত হয়ে বসছে, আমার মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। আমার শিরায় শিরায় উত্তপ্ত শিহরণ বয়ে গেল, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠল। আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম,—যে ভাষায় তাঁকে নিবৃত্ত করব আমার গলার মধ্যেই তা শুকিয়ে গেল। হঠাৎ আমার কপোলে তাঁর চুম্বন অনুভব করলাম। আমার সারা দেহে অসহ্য

কাঁপন জেগে উঠল, সমস্ত শরীর শীতল হয়ে উঠল। ওঁর দিকে তাকালাম। কথা কইবার, এমন কি নড়াচড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত আমি হারিয়েছি, স্থাণুর মত শুধু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম কিসের প্রত্যাশায়। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে, কিন্তু কী ভয়ানক সে মুহূর্ত! ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই ওঁকে ভাল করে দেখে নিলাম— স্ট্র-হ্যাটের নিচে সেই নিচু কপাল, (আমার স্বামীর কপালের সঙ্গে কী অদ্ভুত তার মিল!) সেই সুন্দর খাড়া নাক, স্ফীত নাসারন্ধ্র, মোম-মাখানো বড় বড় গোঁফ, ছোট দাড়ি, মোলায়েম করে কামানো দু'গাল, রোদে-পোড়া ঘাড়ের রঙ। ঘৃণা হল, ভয় হল, পরম বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল,—নিতান্ত অনাত্মীয় বলে তাঁকে মনে হল। কিন্তু তবুও এই ঘৃণ্য, অপরিচিত ব্যক্তির উত্তেজনা, তাঁর কামনা আমার মনে প্রবল প্রতিধ্বনি তুলল,—এই রূঢ় সুন্দর মুখের চুম্বনের কাছে আত্মনিবেদনের জন্য, শির-ওঠা আংটি পরা ঐ সাদা হাতের আদরের জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম। ইচ্ছে হল, নিষিদ্ধ সুখের এই যে গহ্বর আমার সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তার অতলে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হই। ভাবলাম, এমনিতেই তো এত অসুখী আমি,—অ-সুখের ঝড় আরো প্রবল হয়ে, পূর্ণবেগে আমার ওপর দিয়ে বয়ে যাক।

এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। আমি ভাবলাম, এই তো বেশ, লজ্জা আর পাপ আরো গভীর ভাবে আমাকে অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করুক।

ফিসফিস করে আমার কানে কানে তিনি ফরাসী ভাষায় বললেন, তোমায় ভালবাসি। স্বামীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অদ্ভুত সামঞ্জস্য সে কণ্ঠস্বরের। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর কথা, সন্তানের কথা মনে

পড়ে গেল,—মনে পড়ে গেল সেই সব একান্ত·প্রিয়জনের, আমার জীবন থেকে যারা চিরদিনের মত চলে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মাদাম এম্ এর গলা শোনা গেল, মোড়ের মাথা থেকে তিনি আমাকে ডাকছেন। আমার সম্বিৎ ফিরে এল, তাঁর দিকে না তাকিয়ে সবলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই মাদাম এম্-এর কাছে গিয়ে পৌছলাম। মাদাম আর আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম, তারপর তাকালাম তাঁর দিকে,—হ্যাট তুলে, হাসি মুখে তিনি দুয়েকটা মামুলি প্রশ্ন করলেন। যে তীব্র ঘৃণা তখন আমার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তার পরিচয় তিনি পান নি।

সারা জীবন নিতান্ত বিষাদপূর্ণ মনে হল,—ভবিষ্যৎ আশাহীন, অতীত ক্লেদাক্ত বোধ হল। মাদাম এম্ কথা কইলেন, কিন্তু আমার কাছে তা নিতান্ত অর্থহীন মনে হল, যেন নেহাৎ অনুকম্পাবশেই তিনি কথা কইছেন,—আমার ওপর তাঁর যে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে তা ঢাকবার প্রচেষ্টা মাত্র। এই অনুকম্পার পরিচয় পাচ্ছিলাম তাঁর প্রতি কথায়, প্রতিটি দৃষ্টিক্ষেপের মধ্যে; সেই চুম্বনের লজ্জা তখনো আমার কপোলে জ্বালা ধরিয়ে রেখেছে,—স্বামী-পুত্রের কথা মনে হতে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারছি না। ঘরে ফিরে নিরালায় নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করতে বসলাম। কিন্তু একা থাকতে ভরসা হল না। চা এল কিন্তু সে চাও খেলাম না। কী করতে যাচ্ছি না জেনেই বিকেলের গাড়িটা ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম—হিডেলবার্গে যাতে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে পারি।

দাসীকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেণের কামরায় উঠলাম। কামরাটা একেবারে খালি। গাড়ি চলতেই মুক্ত বাতাস জানালা দিয়ে এসে আমার মুখে

লাগল, অনেকটা সামলে নিলাম নিজেকে। অতীত আর ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি আমার মনে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। পিটার্স বার্গে আসার প্রথম দিন থেকে আমাদের দাম্পত্য জীবনের ধারা এক নতুন আলোয় আমার কাছে প্রতিভাত হল,—অনপনেয় কলঙ্কের মতই তা আমার বিবেকের ওপর চেপে বসল। বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকটায় যখন নিকল্‌স্কোয় বাস করতাম তখনকার কথা, ভবিষ্যতের যে পরিকল্পনা তখন করেছিলাম সে সমস্ত কথা এই প্রথম আমার খুব স্পষ্ট মনে হল। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, স্বামীর দিনগুলিই বা কোন্ সুখে এতদিন কেটেছে? হিসেব করে দেখলাম, তাঁর প্রতি আমি অন্যায় করেছি। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু কেন, কেন তিনি আমাকে বাধা দেন নি? কেন ছলনা করে এসেছেন, কেন বুঝিয়ে বলতে চান নি, কেন আমাকে অপমান করেছেন? প্রেমের অমোঘ শক্তিতে কেন তিনি আমাকে নিবৃত্ত করেন নি? কিন্তু দোষ যারই হোক, ঐ অপরিচিত লোকটির চুম্বনের স্পর্শ তখনো যেন আমার কপোলে লেগে রয়েছে। যত হিডেলবার্গের নিকটবর্তী হই, স্বামীর ছবি ততই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর ততই আসন্ন সাক্ষাতের চিন্তায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠি। মনে মনে ঠিক করলাম, সমস্তই তাঁকে খুলে বলব,—অনুতাপের অশ্রুধারায় সমস্ত গ্লানি ধুইয়ে দেব: তাহলেই তিনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবেন। কিন্তু সমস্ত অপরাধ বলতে কী বোঝায় সে আমি নিজেই জানিনা, এবং তিনি যে আমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করবেন, একবারের জন্যও আমি তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারি না।

স্বামীর ঘরে প্রবেশ করে তাঁর শান্ত, বিস্মিত মুখভাব লক্ষ্য করেই

আমি তখনি বুঝলাম, তাঁর কাছে আমার কিছুই বলবার নেই, কোনো অপরাধ স্বীকার করবার, বা ক্ষমা ভিক্ষা করবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই অনুতাপ, এই না-বলা ব্যথা আমাকে নিজের মধ্যেই সঙ্গোপনে রাখতে হবে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ খেয়াল আবার তোমার কেন হল? কালই আমি ব্যাডেনে যাব ভাবছিলাম। এই বলে তিনি আমাকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন, মনে হল যেন উদ্বিগ্ন হয়েছেন। বললেন, কী ব্যাপার, কী হয়েছে বল তো?

না, কিছু নয়। কথাটা বলতে গিয়ে আমি ভেঙে পড়লাম। বললাম, আর আমি ফিরছি না। চল দেশে যাই,—চল, কালই আমরা রাশিয়ায় ফিরে যাই।

কোনো কথা বললেন না তিনি, নির্বাক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, না, বল তোমার কী হয়েছে।

অনেক চেষ্টা করেও আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না, রক্তিম হয়ে উঠলাম, আমার দৃষ্টি আনত হল। ক্রোধ আর অসন্তোষ তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাছে কিছু মনে করেন সেই ভয়ে এমন সুন্দরভাবে মিথ্যার অভিনয় করলাম যে আমার নিজেরই আশ্চর্য বোধ হল। বললাম, না না, কিছু হয়নি। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, অত্যন্ত ক্লান্ত আর মনমরা হয়ে পড়েছিলাম। কেবল মনে হত আমাদের একত্র জীবনধারার কথা। তোমার কাছে আমি অনেক অপরাধ করেছি। কেন আমাকে বিদেশে নিয়ে আসা, তোমার যদি তা ভাল না লাগে? চল নিকল্স্কোয় ফিরে যাই। চির জীবনের মত সেখানেই আমরা বাস করব।

এসব কাঁদুনি ছাড় বাপু,—নীরস গলায় তিনি বললেন, নিকল্‌স্কোয় ফিরে যাওয়া অবশ্য ভাল কথা, কারণ টাকা কমে আসছে, কিন্তু ওখানে গিয়ে বাস করার কথা যা বলছ সে তোমার নিছক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়; জানি, সেখানে থাকতে তুমি পারবে না। চা খাও, খানিকটা সুস্থ বোধ করবে। বলে ভৃত্যকে ডাকবার জন্য তিনি ঘণ্টা বাজাতে উঠলেন।

অনুমান করতে চেষ্টা করলাম, আমার সম্বন্ধে তিনি কী ধারণা পোষণ করতে পারেন। যে দ্বিধা, যে লজ্জা ওঁর দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছিল তা থেকে আন্দাজ করলাম, কতটা বিরূপ চিন্তা তাঁর মনে বাসা বেঁধেছে। অত্যন্ত অপমান বোধ করলাম, ভাবলাম—উনি আমাকে বুঝবেন না, বুঝতে পারবেন না। খোকাকে দেখতে যাচ্ছি—এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে হল একা থাকি, আর কেবল কাঁদি আর কাঁদি।

নিকল্‌স্কোর যে বাড়ি এতদিন ঠাণ্ডা, জনমানবহীন পড়েছিল, আবার তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। কিন্তু অতীতের অনেক কিছুই চিরদিনের মত মুছে গেছে। তাতিয়ানা সেমিনোভ্‌না মারা যাওয়ায় আমরা এখন একা-একা। কিন্তু এই যে পরস্পরকে একান্ত আপন করে পাওয়া, এ আমাদের কাম্য হওয়া দূরে থাক, বরং অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হল। শারীরিক অসুস্থতার জন্য শীতটা আমার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছিল, সে অসুখ আমার সারল মেজো ছেলের জন্মের পর। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পিটার্সবার্গে যেমন ছিল তেমনই হৃদয়হীন রয়ে গেল বটে, কিন্তু গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে এসে প্রতিটি ঘর দেয়াল, প্রতিটি সোফা এখন

আমাকে মনে করিয়ে দেয় তিনি আমার কতখানি ছিলেন, কী হারিয়েছি আমি। যেন এমন এক অপরাধ আমাদের পৃথক করে রেখেছে যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়নি। তিনি যেন শাস্তি দিচ্ছেন আমাকে; অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনার তো কিছু নেই, শাস্তিরও কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি যে আর আগের মত সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমাকে ভালবাসছেন না, শাস্তি তো এই। শুধু আমাকে ভালবাসা নয়, কোন কাজই তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে করতে পারছেন না। হৃদয় দেবেন কি, হৃদয়ই যেন তাঁর হারিয়ে গেছে। কখনো কখনো মনে হত, শুধু আমাকে কষ্ট দেবার জন্যই তিনি অভিনয় করছেন, পুরোনো দিনের অনুভূতি আজও তাঁর মনের কন্দরে সুপ্ত রয়েছে, আর আমি তাকে জাগাতে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হতে পারছি না। যেন কেবলই তিনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছেন,—তাঁর বোধহয় সন্দেহ যে আমি তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার করি না। হয়ত ভয় করছেন, পাছে আবার কাঁদুনির পালা শুরু হয়। তিনি যে সুরে কথা কইতে চান তাঁর চোখের চাউনিতেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেন বলছেন,—কথায় আর কী হবে, সমস্তই আমার জানা আছে। তোমার জিভের আগায় যে কথা এসেছে তাও আমার অজানা নয়, জানি তুমি বলবে এক আর করবে অন্যরকম। যে ভাবে তিনি সযত্নে স্পষ্ট আলোচনাকে এড়িয়ে চলতেন তাতে প্রথমটা আমার খুব কষ্ট হত, কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, স্পষ্ট আলোচনার কোনো প্রয়োজনই তাঁর তরফ থেকে ছিল না। তাকে ভালবাসি—একথা হঠাৎ তাঁকে জানানো, আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিতে অনুরোধ করা কিংবা

আমার পিয়ানো শুনতে বলা,—এসব আর আজকাল সম্ভব নয়। আমাদের প্রতিটি কথা, চালচলন সমস্ত এখন ভদ্রতার নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক চলছে। দুজনের জীবন-ধারা পৃথক খাতে বয়ে চলেছে। তিনি তাঁর কাজ নিয়ে আছেন যেখানে আমাকে তাঁর প্রয়োজন নেই, আর তাঁর কাজে অংশগ্রহণ করবার ইচ্ছে আমার মনে আজকাল একটুও জাগে না। আমার অলস, মন্থর জীবনযাত্রা নিয়েও তাঁকে বিব্রত হতে হয় না। ছেলেপুলেরাও তখনো এত বড় হয়ে ওঠেনি যে আমাদের দু'জনের মধ্যে সেতুর সৃষ্টি করবে।

আবার বসন্ত ফিরে এল, সেই সঙ্গে কাতিয়া আর সোনিয়াও এল গ্রীষ্মটা আমাদের সঙ্গে গ্রামে কাটাবে বলে। নিকল্‌স্কোর বাড়িতে তখন মেরামতি কাজ চলায় আমাদের পুরোণো বাড়ি পক্রভ্‌স্কোয় গিয়ে বসবাস শুরু করলাম। বাড়িটার কোনো পরিবর্তনই হয়নি,—সেই বারান্দা, সেই ফোল্ডিং টেবল, রৌদ্রোজ্জ্বল ড্রইং রুমে সেই আমার পিয়ানো, শয়নকক্ষে সেই সাদা মশারি। আমার কৈশোরকেও যেন ঐ শয়নকক্ষেই ফেলে রেখে এসেছিলাম,—কিশোরের সেই স্বপ্ন যেন আজও ঐ শয়নকক্ষে জড়িয়ে রয়েছে। ঘরে দুটো বিছানা, একটা আমার, নাদুসনুদুস ছোট্ট কোকোশা সেখানে শুয়ে থাকত, রাত্রে গিয়ে আমি ওর ওপর ক্রসের চিহ্ন এঁকে দিতাম,—আর অপরটায় আমার শিশুপুত্র ভানিয়ার ছোট্ট মুখটি চাদরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারত। এমন অনেকবার হয়েছে,—ওদের ওপর ক্রসের চিহ্ন এঁকে দিয়ে স্তব্ধ ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি—হঠাৎ ঘরের চার কোণ থেকে, দেয়াল থেকে, মশারির ওপর থেকে,

কিশোর-বয়সের বিস্মৃত-প্রায় ছবিগুলো ফুটে-ফুটে উঠেছে,—পরিচিত পুরোণো গলায় ধ্বনিত হয়েছে ছেলেবেলার গানের সুর। সে সব দৃশ্য আজ কোথায়? কোথায় আমার অতি প্রিয় সেই পুরোণো গান? যা আমি কখনো আশঙ্কাও করতে পারিনি তাই ঘটেছে! যে এলোমেলো স্বপ্ন আমার মধ্যে অস্পষ্ট ছিল তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। রূঢ় এ বাস্তব,—কঠিন, কঠোর, নিরানন্দ। সমস্তই রয়েছে যথাপূর্ব,—ঘরের জানলা দিয়ে বাগান তেমনি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সেই ঘাস, সেই পথ,—উপত্যকার ওপরে রয়েছে সেই বেঞ্চি, কানে আসছে নাইটিংগেলের সেই গান, সেই লিলাক তেমনি পূর্ণপ্রস্ফুটিত, ছাদের ওপর থেকে চাঁদের তেমনি কিরণসম্পাত—এ সমস্তই রয়েছে আগে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি। অথচ সমস্ত কিছুর মধ্যেই এ কী অভাবনীয় পরিবর্তন দেখছি! যা আমাদের এত প্রিয়, এত আপন হতে পারত, এ কী নিথর নিরানন্দ সে সমস্তকে ঘিরে রেখেছে!

আজও আমি কাতিয়ার সঙ্গে পার্লারে চুপচাপ বসে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করি; কিন্তু কাতিয়ার সে চেহারা আর নেই, তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে, বলিরেখা দেখা দিয়েছে সেখানে। আশার দীপ্তি, আনন্দের জ্যোতি আর তার চোখে ফুটে ওঠে না, সেখানে শুধু ফুটে উঠেছে শান্তনার ভাষা, সহানুভূতির সুর, অনুতাপের আভাস। আগের সে উচ্ছ্বাসও আমরা হারিয়ে ফেলেছি, এখন আমরা শুধু স্থিরভাবে তাঁর বিচার করি। কোন্ ভাগ্যবলে আমরা এত সুখের অধিকারী হয়েছি—এ চিন্তা আর আজকাল আমাদের মনে আসে না; আমাদের মনের কথা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেব—এ বাসনাও আর আমাদের মনে জাগে না। তার বদলে আমরা চক্রান্তকারীদের মত শুধু

ফিসফিস করে কথা বলি, পরস্পরকে একশোবার জিজ্ঞাসা করি, এমন পরিণতি আমাদের কেমন করে হল। অথচ তিনি তো সেই আগের মতই রয়েছেন, দু চোখের মধ্যেকার বলিরেখা কেবল ঈষৎ গভীর হয়েছে, চুলে আর একটু পাক ধরেছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর গম্ভীর, মনোযোগী দৃষ্টি যেন সর্বদাই মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত। আমিও তো সেই একই নারী, কিন্তু কোথায় আমার সেই প্রেম? প্রেমের সে তৃষ্ণাও আর আজকাল আমার মনে জাগে না। কোনো কাজে প্রেরণা নেই মনে তৃপ্তি নেই। আমার একাগ্র প্রার্থনা, আমার ভালবাসা, পুরোণো জীবনের পূর্ণতা—এ সমস্তই যেন কোন্ সুদূর অতীতের স্বপ্ন হয়ে উঠেছে। পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করাতেই প্রকৃত সুখ,—এ সত্য কত সহজ হয়ে আমার মনে জেগে উঠত! আজ কিন্তু তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। পরোপকারে কী সার্থকতা, নিজের জন্য পর্যন্ত যখন জীবনে এতটুকু আসক্তি জাগে না?

পিটার্স বার্গে প্রথম যখন যাই তখন থেকেই সঙ্গীতচর্চা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু পুরোণো পিয়ানো আর গানের বই দেখে আবার তা শুরু করতে লোভ হচ্ছে।

এক দিনের কথা। শরীরটা ভাল না থাকায় বেরোই নি। কাতিয়া আর সোনিয়াকে নিয়ে উনি নিকল্‌স্কোর নতুন বাড়ি দেখতে গেছেন। চায়ের বন্দোবস্ত হয়েছে। নিচে গেলাম, পিয়ানোয় বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। মুনলাইট সোনাটা খুলে বাজাতে শুরু করলাম। আশেপাশে এমন কেউ নেই যে দেখতে বা শুনতে পারে। বাগানের দিকের জানলাটা খোলা। পরিচিত সুরের হাওয়া বিষণ্ণ হয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ঘরের ভিতর ব্যাপ্ত হয়ে উঠছে। প্রথম

কলিটা বাজিয়ে আমি পুরোণো দিনের অভ্যাস মত ঘরের কোণের দিকে তাকালাম, যেখানে বসে তিনি আমার বাজনা শুনতেন। কিন্তু তিনি তো নেই, শুধু তাঁর চেয়ারটা ঠিক সেইখানে সেই একই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জানলা দিয়ে চোখে পড়ছে অস্তসূর্যের আলোয় মাথা লিলাকের কুঞ্জ। পিয়ানোর ওপর কনুই রেখে দুহাতে মুখ ঢাকলাম। চিন্তাগ্রস্তভাবে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। অতীতের চিন্তায় মন ব্যথায় ভরে উঠল। এ অতীত আর তো ফিরে আসবে না! ভবিষ্যতের কল্পনাতেও মন আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে উঠল। ভবিষ্যৎ বলে কিছুই আমার নেই, নেই কোনো আশা, কোনো আকাঙ্ক্ষা। তবে কি জীবনে আমার কিছুই আর রইল না? এ চিন্তাতেও মন আতঙ্কে ভরে ওঠে। মুখ তুলে তাকালাম। চেষ্টা করলাম এ সমস্ত ভুলতে, এ সব চিন্তা থেকে বিরত থাকতে; আবার সেই পুরোণো সুর বাজাতে শুরু করলাম। প্রার্থনা করলাম, হে ঈশ্বর, অপরাধ যদি করে থাকি তো ক্ষমা কোরো, হয় আবার সেই অতীতে নিয়ে যাও যখন আমার সকল দেহ মন ফুলের মত ফুটে উঠেছিল, কিংবা শিখিয়ে দাও কী আমি করব, কী ভাবে জীবন-যাপন করব। সিঁড়ির কাছে গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল, পরক্ষণেই পরিচিত পায়ের সন্তর্পণ শব্দ বারান্দা অতিক্রম করে এসে থেমে পড়ল। ও পায়ের শব্দ আজ আর আমার মনে কোনো সাড়া তুলল না। আমি বাজনা থামাতে একটা হাত পেছন থেকে আমার কাঁধ স্পর্শ করল।

বাঃ, পিয়ানোয় বসেছ, বেশ বেশ।

আমি উত্তর করলাম না।

চা খেয়েছ? উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

ওঁর দিকে না তাকিয়ে আমি মাথা নাড়লাম। যে ভাবাবেগের অভিব্যক্তি আমার মুখে ফুটে উঠেছে, আমি চাই না তা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়।

তিনি বললেন, এক্ষুনি ওরা এসে পড়বে। ঘোড়াটা বাগড়া দিচ্ছিল, উঁচু রাস্তার কাছে এসে ওরা গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে আসছে।

ওদের জন্য দেরি করি তাহলে। বলে আমি বারান্দায় চলে গেলাম। আশা করলাম উনি পিছু পিছু আসবেন, কিন্তু তা না করে উনি জিজ্ঞাসা করলেন ছেলেরা কেমন আছে, তারপর ওদের দেখতে ওপরে চলে গেলেন। তার উপস্থিতিতে তাঁর মিষ্টি কথায় আবার নতুন করে আমার মনে আশা জেগে উঠল—তবে হয়ত আমি সত্যি কিছু হারাইনি! এর বেশি আর কিছু তো আমি আশা করি না! শান্ত-প্রকৃতির মানুষটি উনি, ব্যবহার সুন্দর; স্বামী হিসেবে পিতা হিসেবে আদর্শস্থানীয়। এর বেশি কী যে চাই আমি নিজেই তা জানিনা। আমার বিয়ের কথা যখন পাকা হয়, বারান্দার যে জায়গায় তখন আমি বসতাম সেখানে ঠিক সেই বেঞ্চেই গিয়ে বসলাম। সূর্য অস্ত গেছে, অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে। বসন্তের একখণ্ড সজল মেঘ বাড়িটার ওপরে ঝুলে রয়েছে, আর বাগানের ওপরের দিক্‌চক্রবাল গোধূলির ম্লানায়মান আভায় দেখো যাচ্ছে মেঘলেশহীন, একটা নিঃসঙ্গ তারা শুধু জ্বলজ্বল করছে সেখানে। সমস্ত পারিপার্শ্বিক মেঘের চন্দ্রাতপের নিচে বসন্তের মৃদু বর্ষণের প্রতীক্ষায় উন্মুখ। বাতাস স্তব্ধ, গাছের পাতায় ঘাসের ডগায় পর্যন্ত নেই এতটুকু স্পন্দন। লিলাক আর বার্ড-চেরির তীব্র সুবাসে বাগান আর বারান্দা ভরপুর, সমস্ত বাগান যেন ফুলে ফুলে ভরে রয়েছে। গন্ধটা আসছে

দমকে দমকে, কখনো তীব্র কখনো মৃদু ; ইচ্ছে হচ্ছে দু'চোখ কান বন্ধ করে শুধু এই গন্ধসুধা পান করি। ডালিয়া আর গোলাপ কুঞ্জে এখনো ফুল ধরেনি, চারিদিকের কালোর মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্তব্ধ ; মনে হচ্ছে সাদা খুঁটি বেয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে যেন। উপত্যকার উপারে ব্যাঙগুলো খুব হৈ চৈ করছিল, কিন্তু বৃষ্টি আসতেই তারা চেঁচাতে চেঁচাতে ব্যস্তভাবে পুকুরে চলে গেল। দূরে কোথায় জলের ধারা সবেগে নেমে চলেছে, ব্যাঙের ডাককে ছাপিয়ে উঠছে সে শব্দ। নাইটিংগেলরাও ডাকাডাকি করছে থেকে থেকে, ঝোপ থেকে ঝোপে উড়ে যাওয়ার অস্থির ডানা ঝটপটানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ বসন্তেও একটা নাইটিংগেল জানলার নিচের একটা ঝোপে বাসা বাঁধতে চেষ্টা করেছিল, বারান্দায় যাবার সময় তার ডানার শব্দ কানে এল—দুদিকে গাছের সারি দেওয়া পথ অতিক্রম করে সে উড়ে চলেছে। একবার শীষ দিয়ে সে থেমে পড়ল,—সেও বৃষ্টির প্রতীক্ষায় ছিল।

আমি আমার অনুভূতিকে সংযত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। এক আসন্ন বিপদের চিন্তা, আর অতীতের অনুশোচনা আমাকে আশ্রয় করেছে।

নিচে নেমে এলেন তিনি, আমার পাশে বসলেন। বললেন, ভয় হচ্ছে, ওদের হয়ত ভিজতে হবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটল।

মেঘটা নেমে আসছে ক্রমশ, বাতাস বইছে না। প্রকৃতি ক্রমেই আরো শান্ত, আরো গন্ধঘন হয়ে উঠছে। হঠাৎ এক ফোঁটা বৃষ্টি ক্যানভাসের ওপর পড়ে যেন ছিটকে উঠল, আর এক ফোঁটা পড়ল

সুরকি-বিছোনো পথে। তারপরেই বার্ডকের পাতায় বেশ খানিকটা বৃষ্টি পড়ল। বড় বড় ফোঁটা নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ এক পশলা বৃষ্টি শুরু হল। নাইটিংগেল আর ব্যাঙের দল নীরব, কেবল শোনা যাচ্ছে জল পড়ার উচ্চ শব্দ, বৃষ্টির ফলে মনে হচ্ছে যেন কত দূর থেকে সে শব্দ আসছে। বারান্দার কাছে, শুকনো পাতার আড়ালে বুঝি একটা পাখি আশ্রয় নিয়েছিল, সে তার একঘেয়ে ডাক ডেকে উঠল। ভেতরে যাবেন বলে উনি উঠে পড়লেন।

ওঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করলাম, বললাম, কোথায় যাচ্ছ, বেশ তো লাগছে এখানে।

যাই, ওদের ছাতা আর গালোশ পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

সেজন্য ব্যস্ত হবার দরকার নেই, এ বৃষ্টি এক্ষুণি থেমে যাবে।

আমার কথায় উনি আর উঠলেন না, আমরা বারান্দায় বসে রইলাম। বারান্দার রেলিঙ্ এক হাতে ধরে মাথাটা গলিয়ে দিলাম, বৃষ্টির তাজা জলে আমার চুল, ঘাড় ভিজে গেল। ক্রমে হালকা আর পাতলা হতে হতে মেঘটা মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। বৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন ধারা বন্ধ হল, এখন শুধু আকাশ থেকে কিংবা গাছের পাতা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। আবার ব্যাঙের ডাক শুরু হল, নাইটিংগেলরাও ঘুম ভেঙে উঠে জল-ঝরা কুঞ্জের এদিক-ওদিক থেকে গান শুরু করল। সমস্ত প্রকৃতি আবার পরিষ্কার হয়ে উঠছে। কী চমৎকার! বারান্দায় আমার পাশে বসে, আমার ভিজে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বলে উঠলেন।

এই সামান্য আদর আমার কাছে ভৎর্সনার মত মনে হল, কান্না এল আমার।

উনি বললেন, এর বেশি আর মানুষের কী প্রয়োজন? যা পেয়েছি এর বেশি আর কোনো আকাঙ্ক্ষা আমার নেই, এতেই আমি তৃপ্ত।

মনে পড়ল একদা তিনি অন্যরকম বলেছিলেন। বলেছিলেন, যত খুসীই তিনি হোন না কেন; অধিক সুখের তৃষ্ণায় সর্বদাই তিনি উন্মুখ। অথচ আজ তিনি শান্ত, তৃপ্ত; আর না-বলা অনুতাপে, না-ফেলা চোখের জলে আমার মন গুরুভার হয়ে রয়েছে। বললাম, শুধু কি তৃপ্ত, এতে আমার উল্লসিত হবার কথা। কিন্তু চারিদিকের এই সৌন্দর্য আমার মনে বিষাদের ছাপ এনে দিচ্ছে। আমার বাইরে সমস্তই কী অপরূপ কী লাবণ্যময়, আমার হৃদয়ই কেবল জটিলতায় ভরা—পদে পদে কেবল পরাজয়, শুধু অতৃপ্ত কামনার আবছায়া আমাকে ঘিরে রেখেছে! এও কি সম্ভব যে বেদনার চিহ্নমাত্র তোমার মধ্যে নেই, প্রকৃতির এই শোভা উপভোগ করতে করতে কি অতীতের পুরোনো দিনে ফিরে যাবার বাসনা প্রবল হয়ে তোমার প্রাণে জাগে না?

আমার মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিলেন তিনি। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, এমন অনুভূতি আমার প্রাণেও জাগত। এমন ভাবে কথাটা বললেন, কেন অতীতের কথা মনে করবার চেষ্টা করছেন। বললেন, বসন্তের দিনেই বিশেষ করে তা জাগত। কত রাত কেবল বসে বসে কাটিয়েছি, সঙ্গী হয়েছে শুধু আশা আর আকাঙ্ক্ষা—সঙ্গী হিসেবে বড় ভাল ওরা। কিন্তু আমার সমস্ত জীবনটাই তখন ছিল বাকি। আর আজ আমি জীবনকে পেছনে ফেলে এসেছি, যা পেয়েছি তাতেই আজ আমি তুষ্ট। এ জীবন আমার অতি সুন্দর মনে হচ্ছে—কথাটা সঙ্গোপনে বললেও এমন এলোমেলো ভাবে উনি

বললেন যে শুনে যত কষ্টই আমি পাইনা কেন, কথাটা যে সত্য তাতে সন্দেহ রইল না।

বললাম, কিন্তু আর কি কোনো বাসনাই তোমার নেই?

অসম্ভবের পায়ে মাথা খুঁড়তে আমি চাই না,—আমার চিন্তার সূত্র আন্দাজ করে তিনি বললেন। আমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত চাপড়ে দিলেন, চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন,—যেন ছোট শিশুটি আমি। বললেন, তুমি বৃষ্টির জলে মাথা ভিজিয়ে নিচ্ছ, ঐ যে গাছের পাতায় ঘাসে ঘাসে বৃষ্টির ঝরছে এতে তোমার মনে ঈর্ষ্যা জাগছে, ইচ্ছে হচ্ছে তুমি নিজেও যদি অমন ঘাস বা গাছের পাতা বা বৃষ্টিবিন্দুতে পরিণত হতে পারতে! কিন্তু আমার সুখ শুধু এ সমস্তকে উপভোগ করেই। যাকিছু রমণীয়, যা কিছু যৌবনের প্রতীক, যা কিছু সুখী, সেই সমস্তকে প্রত্যক্ষ করেই আমার তৃপ্তি।

জিজ্ঞাসা করলাম, অতীতের কোনো চিন্তাতেই কি তোমার দুঃখ হয় না? এক গুরু ভার ক্রমেই আমার হৃদয়ে চেপে বসছে।

এবারও তিনি উত্তর দেবার আগে একটু চিন্তা করলেন। বুঝলাম যা বলবার তা তিনি খোলাখুলি ভাবেই বলবেন।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, না, কিছু না।

হতে পারে না, এ কিছুতেই হতে পারে না। তাঁর চোখে চোখ রেখে আমি বলে উঠলাম, সত্যি বলছ, অতীতের জন্য কোনো অনুশোচনাই তোমার মনে জাগে না?

না। অতীতের ঐশ্বর্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ হলেও সেজন্য কোনো অনুশোচনাই আমার হৃদয়ে নেই।

কিন্তু তা ফিরে পাবার ইচ্ছেও কি তোমার মনে হয় না?

তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাগানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বললেন, না। সে আশা করাও যা, আমার ডানা গজাক এ আশা করাও তাই। না, সে অসম্ভব।

অতীতকে যদি পালটাতে পারতে তাহলেও কি তা চাইতে না তুমি? অতীতের কি কোনো ক্ষোভ তোমার মনে নেই,—আমার ওপরে কিংবা তোমার নিজের ওপরে?

না, কক্ষনো না। যা হয়েছে এই ভাল সবচেয়ে।

শোনো। তাঁর হাত স্পর্শ করলাম, যাতে তিনি আমার দিকে মুখ ফেরান,—ঠিক তোমার ইচ্ছে মতই আমি জীবনের পথে চলি—এই যে তোমার ইচ্ছে, একথা আগে কেন জানাওনি, এমন স্বাধীনতা কেন আমাকে দিলে যার উপযুক্ত আমি নই? কেন তোমার শিক্ষাদান বন্ধ করলে? সেই ইচ্ছেই যদি তোমার মনে ছিল কেন তবে আমাকে সেভাবে তৈরি করলে না, এসব অঘটন তো তাহলে ঘটতে পারত না!—আমার কথার সুরে সে প্রণয়-মধুর ভাব আর নেই, বিরক্তি আর ভৎসনার সুর ক্রমেই তাতে প্রকট হয়ে উঠছে।

অবাক হয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, কী ঘটতে পারত না তাহলে? এখন যা হয়েছে তাতে তো দোষ কিছু নেই, বেশ ভালই হয়েছে তো!—শেষের কথাটা তিনি মৃদু হেসে বললেন।

আমি ভাবলাম, সত্যিই কি উনি বুঝতে পারছেন না, না কি, তার চেয়েও যা দুঃখের কথা, বোঝবার কোন চেষ্টাই করছেন না?

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, সেভাবে যদি আমাকে চালিয়ে আসতে তাহলে তো এ অবস্থার উদ্ভব হত না? এই যে আমাকে বিনা দোষে তোমার অবহেলা, তোমার ঘৃণা সহ্য করতে হচ্ছে এ তো অনায়াসেই

এড়ানো যেত? জীবনে আমার যা পরম আকর্ষণ, তাও তুমি এমন অন্যায় ভাবে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারতে না!

কী বলছ তুমি, মাশা?—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কথার ভাবে মনে হল তিনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না।

না না, বাধা দিয়ো না। তোমার বিশ্বাস, তোমার প্রেম, এমন কি তোমার শ্রদ্ধা পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছ। অতীত দিনের কথা চিন্তা করলে কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না যে তুমি আমাকে ভালবাস। না, কথা কয়ো না। এতদিন ধরে যে যন্ত্রণা ভোগ করে আসছি, একবারের মত অন্তত তা মুখ ফুটে বলতে চাই। জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা যখন আমার ছিল না, তুমি চেয়েছিলে নিজে থেকেই আমি তা অর্জ্জন করি,—সে কি আমার দোষ? এই যে আজ সে অভিজ্ঞতা জীবন দিয়ে লাভ করেছি, এই যে প্রায় একবছর ধরে তোমার কাছে ফিরে আসবার চেষ্টা করছি আর তুমি আমাকে না বোঝবার ভান করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ, এও কি আমার দোষ? আর তুমি সমস্ত ব্যাপারটার এমন একটা রূপ দিচ্ছ যাতে তোমাকে কোনো দোষ দেওয়া সম্ভব না হয়, আর সমস্ত অপরাধের, সমস্ত দুঃখের ভাগ আমার ওপরে এসে পড়ে। হ্যাঁ, আবার তুমি আমাকে সেই জীবনেই ঠেলে দিতে চাইছ যার ফলে আমাদের দুজনেরই সুখশান্তি চিরতরে নষ্ট হতে পারে।

কিসে তোমার এ ধারণা হল? সভয়ে, সবিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

এই তো কালই তুমি বললে,—কাল কেন, প্রায়ই তুমি বল যে আমি কিছুতেই এখানে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারছি না,—এবং

এবারের শীতটাও তাই আমাদের পিটার্সবার্গে কাটাতে হবে—অথচ পিটার্সবার্গের সে জীবনে যে আমার পরম বিতৃষ্ণা এসেছে তা সত্ত্বেও। কোথায় আমার সহায় হবে তা নয়, কেবলই তুমি স্পষ্ট কথা এড়িয়ে চল, ভুলেও কখনো একটা মিষ্টি কথা প্রাণ খুলে বল না। আর, যখনি আমার মধ্যে কোনো দোষত্রুটির সন্ধান পাও তুমি আমাকে ভৎর্সনা কর, আমার দুর্দশায় তোমার আনন্দ হয়।

থাম! রূঢ়, নিষ্প্রাণ স্বরে তিনি বলে উঠলেন, একথা বলার কোনো অধিকার তোমার নেই! এ থেকে শুধু এই প্রমাণই হয় যে তুমি আমার প্রতি বিরূপ, তুমি আমাকে—

—যে আমি তোমাকে ভালবাসি না, এই তো? বল, ইতস্তত করবার দরকার কী? আমি কেঁদে ফেললাম, দু গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বেঞ্চের ওপর বসে আমি রুমালে মুখ ঢাকলাম।

কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কান্না থামাবার চেষ্টা করে বললাম, তুমি যাকে প্রেম বলছ, আমি তাকে বলি অত্যাচার। কেন তুমি আমাকে সমাজে মেশবার সুযোগ দিলে, জানতেই যদি যে এর বিষময় ফলে তোমার প্রেমের অবসান ঘটবে?

না না, সমাজ এর জন্য দায়ী নয়।

কেন তুমি আপন ক্ষমতায় আমাকে বিরত করলে না, কেন ঘরে বন্ধ করে রাখলে না, হত্যা করলে না? এভাবে প্রেমের সমাধি হওয়ার চেয়ে সেও তো শতগুণে বরণীয় হত! তাতেও আমি সুখী হতাম, এমন লজ্জাকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতাম।

মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

এমন সময় কাতিয়া আর সোনিয়া বারান্দায় এল। বৃষ্টিতে ভিজে

ওদের খুব ফুর্তি হয়েছে—খুব হাসছে, জোরে জোরে কথা কইছে। আমাদের দেখে ওরা চুপ করে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটল। কেঁদে কেঁদে মনটা হালকা হয়ে গেছে। ওঁর দিকে তাকালাম। হাতে মাথা ভর করে উনি বসে ছিলেন, আমার দৃষ্টির উত্তরে কি একটা বলতে চাইলেন। কিন্তু কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে আবার তেমনিই বসে রইলেন।

ওঁর কাছে গেলাম, সরিয়ে দিলাম হাতটা। চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, হ্যাঁ,—এমনভাবে শুরু করলেন, যেন তিনি তাঁর চিন্তাসূত্রের পুনরাবৃত্তি করছেন—আমাদের সকলেরই, বিশেষ করে তোমরা যারা স্ত্রীলোক তাদের দরকার, জীবনের সমস্ত দোষত্রুটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা, জীবনের প্রকৃত রূপের সঠিক পরিচয় পাওয়া যাতে সম্ভব হয়। তখনো তুমি সেই দোষত্রুটির শেষপ্রান্তে উপস্থিত হওনি। দোষে ত্রুটিতে ভরা তোমাকে তখন আমার বড় ভাল লাগত। তাই আমি তোমার পথে বাধা হইনি, কারণ ভেবে দেখেছিলাম, আমি নিজে সে-অবস্থা অনেকদিন পেরিয়ে এলেও তোমাকে বাধা দেবার কোনো অধিকারই আমার নেই।

সত্যিই যদি তুমি আমাকে ভালবাসতে, আমাকে ভুল পথে চলতে দেখেও কেন তবে তুমি নিরস্ত রইলে?

কারণ, কথা কানে তোলবার মত অবস্থা তখন তোমার ছিল না। হাজার চেষ্টা করলেও তুমি তা পারতে না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল,—সে অভিজ্ঞতা এতদিনে তুমি অর্জ্জন করেছ।

অনেক হিসেবের কথাই বললে বটে, কিন্তু ভালবাসার কোনো পরিচয় এতে পাওয়া গেল না।

আবার নীরবতা।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে তিনি বললেন, এইমাত্র যা তুমি বললে, কথাটা রূঢ় হলেও সত্য। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ তুমি, দোষ আমারই। এই পর্যন্ত বলে আমার সামনে এসে বললেন, আমার উচিত ছিল হয় তোমাকে ভালবাসা, কিংবা একটু অন্যভাবে, অনেক সহজ খাতে আমার ভালবাসাকে চালিয়ে নেওয়া।

এসব আমাদের ভুলে যাওয়াই ভাল, ভয়ে ভয়ে আমি বললাম।

হ্যাঁ, অতীতকে তো ফিরিয়ে আনা যায় না ; তা সম্ভব নয়। বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ কোমল হয়ে এল।

তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললাম, কেন, ইতিমধ্যেই তো আবার তা ফিরে এসেছে।

আমার হাতটা টেনে নিয়ে তাতে মৃদু চাপ দিয়ে তিনি বললেন, আমি বলেছিলাম, গতস্য শোচনা আমার মধ্যে নেই। কিন্তু আমি ভুল বলেছিলাম। সত্যিই আমার অনুশোচনা হচ্ছে। যে অতীত আর কখনো ফিরে আসবে না তার জন্য আমি অশ্রুমোচন করি। দোষ কার, জানিনা। প্রেমের অবসান নেই, কিন্তু আমাদের প্রেমের রূপান্তর ঘটেছে। প্রেম রয়েছে অচঞ্চল, কিন্তু তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত সত্তা নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু স্মৃতি মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে, আর আছে কৃতজ্ঞতার বোধ। কিন্তু—

বোলোনা, ও কথা বোলোনা। আবার সব যেমনটি ছিল তেমনি হোক। কেন তা সম্ভব হবে না?—ওঁর চোখে চোখ রেখে আমি প্রশ্ন করলাম। শান্ত, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকালেন, সে দৃষ্টি আমার চোখের গভীরে প্রবেশ করল না।

আমার কথা শেষ হবার আগেই কিন্তু বুঝলাম যে আমার এ আকাঙ্ক্ষা, এ মিনতি কখনো চরিতার্থ হবার নয়। শান্ত ভাবে, ধীরে উনি হেসে উঠলেন,—মনে হল এ যেন কোন্ বৃদ্ধের হাসি।

হাসি মুখে বললেন, এখনো কত ছেলেমানুষ তুমি, আর দেখ, আমার কত বয়স হয়েছে। আমার মধ্যে যা তুমি চাইছ তার অবসান ঘটেছে। আর আমাদের এ আত্মপ্রবঞ্চনা কেন?

নীরবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। মন অনেকটা শান্ত হল।

উনি বলে চললেন, অতীতকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আর থাক, আত্মপ্রবঞ্চনাও যথেষ্ট হয়েছে। অতীত দিনের ভাবাবেগ আর উত্তেজনা যে প্রশমিত হয়েছে এতেই তুষ্ট থাকা উচিত। সুখের সন্ধানের সে উত্তেজনা আর আমাদের জীবনে নেই; তারও অবসান হয়েছে; যথেষ্ট সুখ আমাদের ভাগে পড়েছে। এখন আমাদের কারুর জন্যে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ানো উচিত—ভানিয়াকে নিয়ে নার্স যাচ্ছিল, তাকে দেখিয়ে বললেন,—এই ধর, ভানিয়ার জন্যে। আসল সত্য হল এই;—বলে আমার মাথাটা কাছে টেনে এনে তিনি তাতে চুম্বন করলেন। প্রেমিকের চুম্বন এ নয়, নিতান্ত বন্ধুসুলভ এ চুম্বন।

রাত্রির সুগন্ধ ক্রমেই তীব্র হয়ে বাগান থেকে আসছে। সমস্ত শব্দ, এমনকি নিস্তব্ধতা পর্যন্ত আরো গম্ভীর হয়ে উঠছে, মাথার ওপরে জ্বলে উঠছে তারার পর তারা। ওঁর দিকে তাকাতে হঠাৎ আমার মন হালকা হয়ে গেল, মনে হল, যেজন্য আমার এ যন্ত্রণা তার নিরসন হয়েছে,—যেন নার্ভের ব্যথায় ভুগে বহুদিন পর সেরে উঠেছি। নিঃসন্দেহে বুঝলাম, আমার অতীতের অনুভূতি অতীতের সঙ্গেই চিরদিনের মত হারিয়ে গিয়েছে,—তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুধু অসম্ভব

নয়, যেমন কষ্টকর, অস্বস্তিকরও তেমনি। আর তা ছাড়াও, অতীতকে যত সুখের মনে হচ্ছে আসলে সত্যিই কি তাই? তাকে তো আজ কত পেছনে ফেলে এসেছি!

উনি বললেন, চায়ের সময় হল। একসঙ্গে পার্লারে গেলাম। দরজার কাছে নার্স আর খোকার সঙ্গে দেখা হল। খোকাকে কোলে নিলাম, খালি পা দুটো ঢেকে তাকে বুকে চেপে ধরলাম, খুব আলতো ভাবে চুমু খেলাম। আধো ঘুমে খোকা হাতের মুঠো খুললো, তন্দ্রাতুর চোখ মেলে তাকালো,—যেন কি খুঁজছে কিংবা কিছু মনে করবার চেষ্টা করছে। অমনি ওর চোখে চোখ পড়ল, যেভাবে তাকাল তাতে মনে হল আমাকে চিনতে পেরেছে। ছোট্ট ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে ছিল, এখন সেখানে হাসি ফুটে উঠল। খোকা খোকা, আমার খোকা—বুকে চেপে ধরলাম তাকে। সুখের আতিশয্যে আমার সর্বশরীর কাঁপছে, ভয় হচ্ছে পাছে খোকা ব্যথা পায়। চুমোয় চুমোয় ভরে দিলাম ওর ঠাণ্ডা ছোট ছোট পা দুটো,—ওর পেট, ওর হাত, ওর পালকের টুপি পরা মাথা। স্বামী আমাদের কাছে এলেন, আর অমনি আমি তাড়াতাড়ি খোকার মুখটা একবার ঢেকেই আবার খুলে ফেললাম।

ইভান সার্জেইচ! খোকার থুতনির নিচে শুড়শুড়ি দিয়ে স্বামী বলে উঠলেন, কিন্তু আমি আবার তাড়াতাড়ি তাকে ঢেকে ফেললাম—আমি ছাড়া আর কারুর তার দিকে তাকাবার অধিকার নেই। স্বামীর দিকে তাকালাম, তিনিও হাসিমাখা চোখে আমার দিকে তাকালেন। এমন সহজভাবে যে তাঁর দিকে তাকানো যায়, তাতে যে এত আনন্দ, এ আমি অনেক দিন ভুলে ছিলাম।

বিবাহের রোমান্সের সেদিন আমাদের অবসান, অতীতের অনুভূতি আজ শুধু অসম্ভবের অমূল্য স্মৃতি। ছেলেমেয়েদের আর তাদের পিতার প্রতি এক নতুন ভালবাসা আমার হৃদয়ে জেগে উঠেছে, তারই ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আমার নতুন জীবন, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক সুখানুভূতি। সেই জীবন, সুখের সেই অনুভূতি আজ পর্যন্ত আমার জীবনে চলে আসছে।